ক্ষুদে গোয়েন্দা পিকলু

মিহির সেন



ক্ষুদে গোয়েন্দা পিকলু

মিহির সেন

জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স
৫৯/১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

KSHUDE GOENDA PIKLU

Selected Short Story

by Mihir Sen

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৮৭

প্রকাশক : শান্তনু ভাণ্ডারী

মুদ্রণ : জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স, ৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

পনেরো টাকা

শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখকদের অন্যান্য বই

কলাবতী (ছড়া)
টিকটিক্ (ছড়া)
চীন-জাপানের রূপকথা (রূপকথা)
খুকুর পুতুল টুকটুক (গল্প)
লেনিনের মা (জীবনালেখ্য)
লোক হাসানো লোকটি (জীবনালেখ্য)

সূচীপত্র



ক্ষুদে গোয়েন্দা পিকলুর কয়েকটি কাণ্ড কারখানার কাহিনী বিভিন্ন সময়ে ছোটদের কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার ভেতর কয়েকটির বেতার-নাট্যরূপও প্রচারিত হয়েছিল। সে-সব কাহিনীই সংকলিত হল বইটিতে।

ছেলেবেলা থেকেই পিকলু দেশী বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনী পেলে গোগ্রাসে গেলে। তাই, পিকলুর নিজেরও ধারণা, ওর কিছু গোয়েন্দা ক্রীয়াকর্মের ক্ষেত্রে কিছু বিদেশী সূত্রর অনুপ্রেরণা থাকলেও থাকতে পারে।

উৎসর্গ

শ্রীমতী শ্রাবন্তী মজুমদারকে—



এ জন্যই পারতপক্ষে কোন নেমন্তন্ন বাড়ি যেতে চায় না পিকলু।

বড়রা সব ব্যস্ত থাকে নিজেদের নিয়ে, ছোটদের কেউ আমলই দেয় না। কপালগুণে সমবয়সী কোন পরিচিত ছেলে পেয়ে গেলে তবু একরকম, না হলেই বোকার মত মুখ করে এদিক-ওদিক একা ঘুরে বেড়ানো আর পরিচিত বয়স্কদের দেখলে ঢপ্ ঢপ্ করে গিয়ে প্রণাম করা।

আজও তাই তাপসকাকুর বৌভাতে আসতে চাইছিল না পিকলু। কিন্তু মা-ই ওকে জোর করে ধরে এনেছে। তাপসকাকু এত করে বলে দিয়েছেন, সবাই মিলে না এলে নাকি অভদ্রতা দেখায়।

তবু কপাল ভাল, ঢুকতেই দেখে গেটের মুখে জয়ন্তকাকু। বাবার বন্ধু হলেও ওদের সঙ্গেও বন্ধুর মতই সম্পর্ক ওর। ভীষণ রসিক। কিন্তু একটা দোষ, সুযোগ পেলেই পিছে লাগবে।

ওদের দেখে একগাল হেসে এগিয়ে আসে জয়ন্তকাকু, আসুন, আসুন পিকলুবাবু, আপনাদের অভ্যর্থনার জন্যই সেই বিকেল থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

মা একটু হেসে বলল, কাল বিকেল থেকে শুনলাম ?

জয়ন্তকাকু কপট গাম্ভীর্যে জবাব দিল, সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে এসেছ, ঠাট্টা তো করবেই বৌদি, কিন্তু তাপসের বৌভাতে সেই সকাল থেকে যে কী ধকলটা যাচ্ছে—

জয়ন্তকাকুর কথার ভেতরই এগিয়ে আসে তাপসকাকু। সঙ্গে এক ভদ্রলোক। বাধা দিয়ে বলে, ওর কথার একবিন্দু বিশ্বাস করবে না বৌদি। সেই সকাল থেকে বসে চা ধ্বংস করছে আর মজলিস জমাচ্ছে।

বেজার মুখে জয়ন্তকাকু জবাব দেয়, এজন্যই আজকালকার দিনে কারো উপকার করতে নেই, বুঝলে বৌদি ? কোন স্বীকৃতি নেই।

তাপসকাকু এবার নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় সবার। ভদ্রলোক শিলং থেকে এসেছেন। নাম অমল রায়। শিলংয়ে তাপসকাকুর এক মামাতো বোনের বিয়ে হয়েছে, ভদ্রলোক তারই দেওর। মামাতো বোনটি নাকি বারে বারে বলে দিয়েছিলেন, কলকাতায়ই যখন আসছেন, উনি যেন একবার তাপস কাকুদের সংবাদ নিয়ে যান।

অমলবাবু সলজ্জ হেসে বললেন, এসেই ফেঁসে গেলাম দাদা। জানতাম না যে আজ ওঁর বৌভাত। উনি এমন জোর করে ধরে রাখলেন যে—

জয়ন্তকাকু হেসে বলল, আপনারা বাংলা দেশের বাইরে থাকেন বলেই এত সঙ্কোচ, দাদা। আমরা এমন আকালের ভেতর আছি, যে নেমন্তন্নের গন্ধ পেলে নিজেরাই জোরজার করে গিয়ে ঢুকে পড়ি।

জয়ন্ত কাকুর কথায় সবাই হেসে ওঠে।

তাপসকাকুর চারদিকে ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, তাই অমলবাবুকে ওদের হাতে সঁপে দিয়ে গেল।

এরপর কিছুক্ষণ জয়ন্তকাকুর সঙ্গে কথাবার্তা চলল অমলবাবুর। সেই আলোচনা থেকে জানতে পারে পিকলু, অমলবাবু শিলংয়ের একজন

পুলিশ অফিসার। ভদ্রলোককে এতে বেশ গর্বিতও মনে হল। সুযোগ পেয়ে সাড়ম্বরে উনি ওঁর পুলিশ জীবনের নানা বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের কথা শুনিয়ে যাচ্ছিলেন সবাইকে। জয়ন্তকাকুর মুখ দেখেই বুঝছিল পিকলু, উপায় নেই বলেই গল্পগুলো কুইনাইনের মত গিলছে কাকু।

অমলবাবু সিগারেট ধরানোর জন্য একটু থামতেই জয়ন্তকাকু তাই সুযোগ পেয়ে পিকলুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, তারপর পিকলুবাবু, পড়াশুনো কেমন চলছে?

মা মুখ টিপে হেসে বলে, দারুণ। পিকলু আজকাল রাত দিন বই নিয়েই পড়ে থাকে, অবশ্য পড়ার বই না, রাজ্যের ডিটেকটিভ বই। ওর হিরো এখন পৃথিবীর বিখ্যাত সব গোয়েন্দারা।

জয়ন্তকাকু সাজানো উচ্ছ্বাস নিয়ে বলে, তাই নাকি? তাহলে ছ'চার বছরের মধ্যেই ভারতমাতা একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা সন্তান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করছেন বল!

সবাই হেসে ওঠে। পিকলু অপমানিত বোধ করে। একটু বিরক্ত হয়েই বলে, এতে ঠাট্টার কিছু নেই কাকু। যার একটু বুদ্ধি আর পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে সেই গোয়েন্দা হতে পারে।

জয়ন্তকাকু বলে, বেশ, সুযোগ মত পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

পিকলু বলল, সুযোগের জন্য অপেক্ষা করার দরকার কি জয়ন্তকাকু, আমি এখনই সেটা প্রমাণ করে দিতে পারি।

অমলবাবু পিকলুর কথায় এতক্ষণে যেন ওকে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

কৌতূহলে সোজা হয়ে বসে এবার জয়ন্তকাকু বলে, বেশ তো, প্রমাণ হয়ে যাক।

পিকলু নির্লিপ্তভাবে বলে, তোমাকে সম্প্রতি ডাক্তার সিগারেট খেতে নিষেধ করেছেন।

কথাটা শুনে একটু যেন অবাক হয় জয়ন্তকাকু। তারপর বলে, নিশ্চয়ই কথায় কথায় তোর বাবাকে, বা মাকে কথাটা বলেছিলাম কোনদিন, ওদের কাছেই শুনেছিস তুই।

মা বলল, না তো। গত এক মাসের ভেতর তো আপনি আমাদের বাড়ির দিকে পাও বাড়ান নি।

জয়ন্তকাকু এবার সত্যিই অবাক হয়ে ফিরে তাকায় পিকলুর দিকে, তাহলে কি করে বুঝলি তুই?

পিকলু একটু হেসে বলে, একেই বলে পর্যবেক্ষণ।

—মানে?

পিকলু গম্ভীর মুখে এবার মানেটা বুঝিয়ে দেয়। বলে, আমরা সবাই জানি, তুমি খুব বেশী সিগারেট খাও। কিন্তু আজ আসার পর থেকে তোমাকে একটাও সিগারেট খেতে দেখিনি। শুধু তাই নয়, কথা বলতে বলতে বার তিন-চার তুমি অন্যমনস্কে সিগারেটের প্যাকেট বের করার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলে। কিন্তু প্রত্যেকবারই সচেতন হয়ে পকেট থেকে হাত বের করে আনলে। মুখে তখন একটা চাপা বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠছিল তোমার।

জয়ন্তকাকু বলল, সেটা তো সিগারেট ফুরিয়ে যাবার জন্যও হতে পারে?

পিকলু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, কিন্তু গেটের মুখেই একটা বড় সিগারেটের দোকান আছে আমি লক্ষ্য করেছি। শুধু তাই নয়, তোমার আঙ্গুলের দিকে তাকিয়েও আমি বুঝেছিলাম, কিছুদিন তুমি সিগারেট খাচ্ছ না।

—কি করে?

—বেশী সিগারেট খাওয়ায় তোমার আঙ্গুলে যে হলুদ ছোপটা পড়েছিল, লক্ষ্য করলাম সেটা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে।

এতক্ষণ মা অবাক্ হয়ে পিকলুর কথা শুনছিল। এবার বলল, সবই মানলাম, কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করেছেন কি করে বুঝলি?

পিকলু এবার হেসে বলল, এটা কমনসেন্সের ব্যাপার। হিসেব করে দেখলাম, কাকু যেমন বেপরোয়া তাতে আর কারো নিষেধে সিগারেট ছাড়ার লোক নন উনি! এ নিয়ে কাকীমাও দু'একদিন তোমার কাছে অনুযোগ করেছেন, শুনেছি আমি। একমাত্র ডাক্তার

ভয় দেখালেই কাকুর মত লোকরা সিগারেট ছাড়তে পারে।

উল্লাসে পিকলুকে জড়িয়ে ধরে জয়ন্তকাকু।—সাবাস পিকলুবাবু, সাবাস! ক্ষুদে গোয়েন্দা বলে আর তোকে ঠাট্টা করার উপায় নেই।

অমলবাবুও একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পিকলুকে দেখে নিয়ে বলেন, ছেলেটি সত্যিই বেশ ইনটেলিজেন্ট দেখছি।

ইতিমধ্যে তাপসকাকু খোঁজ নিতে আসে, এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ প্রথম ব্যাচে বসবে কিনা।

আশপাশ থেকে কয়েকজন নিমন্ত্রিত উঠে যান। মা পিকলু আর ওর বোনকে নিয়ে ওপরে যান বউ দেখতে। পিকলু একবার আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু মা-ই ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়।—বৌভাতে এসেছিস, বৌ না-দেখে চলে যাবি এ কেমন কথা? এত লজ্জারই বা কি আছে, আমিই তো সঙ্গে আছি, চল।

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার সঙ্গে যেতে হল পিকলুর।

ওপরে বউয়ের ঘর তখন জমজমাট। মেয়েদের জমাট মজলিস। রঙ-বেরঙের শাড়ি আর গয়নায় যেন ঝলমল করছে গোটা ঘরটা। আর তারই মাঝখানে সেজেগুজে বসে আছে নতুন বৌ।

এসব জায়গায় এলে কেমন যেন দমবন্ধ হয়ে আসে পিকলুর। নতুন বৌকে দেখে মায়া হয়। যেন একটা মাটির পুতুল। নিজের ইচ্ছায় নড়াচড়ারও উপায় নেই।

মা ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকতেই কয়েকটি মেয়ে হৈ-হৈ করে উঠল, এই তো, বৌদি এসে গেছে। এত দেরী হল যে? নেমন্তন্ন খেতেই এলে বুঝি?

এসব কপট অনুযোগ আর ঠাট্টা রসিকতাগুলোও যেন সব বিয়ে বাড়িতেই এক।

মা ওদের কথার জবাব দিতে দিতে নতুন বৌয়ের দিকে এগিয়ে যায়। সঙ্গে আনা উপহারটা এগিয়ে দেয় বৌয়ের দিকে।

একটি মেয়ে মা'র পরিচয় করিয়ে দেয়। দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল জয়ন্তকাকু, হঠাৎ ঘরে ঢুকে, পিকলুর কাঁধে একটা হাত রেখে

চেঁচিয়ে ঘোষণা করে, আর এটি তোমার এক গোয়েন্দা ভাসুর পো, ঊর্মি।

সবাই ফিরে তাকায়। কৌতূহলে নতুন বৌও চোখ খুলে তাকায় পিকলুর দিকে। মুখে কৌতুকের হাসি।

লজ্জায় মাথা নিচু করে পিকলু। জয়ন্তকাকু ততক্ষণে হাওয়া।

পিকলু থাকবে না বেরিয়ে যাবে ভাবছে, হঠাৎ গোটা বাড়ির আলো নিভে গেল। চারদিকে হৈচৈ শুরু হল। এঘরেও ছুটোছুটি হৈ-হল্লা।

হঠাৎ কে যেন ভারী জুতোয় পিকলুর পা মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অস্ফুটে উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল পিকলু। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বৌয়ের চীৎকার শোনা গেল, আমার নেকলেস, কে যেন আমার নেকলেসটা নিয়ে গেল।

নতুন করে আবার ভয়ার্ত চীৎকার, চেঁচামেচি, ছুটোছুটি শুরু হল ঘরের ভেতর। পিকলুকে কে যেন ধাক্কা মেরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পিকলু টাল সামলে তাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেও হাত ফস্কে গেল।

আর, ঠিক তক্ষুনি গোটা বাড়ির আলো জ্বলে উঠল আবার।

ঘরের প্রায় সামনেই দেখা গেল অমলবাবুকে। বোধহয় এঘরে চীৎকার শুনেই ছুটে আসছিল। ঠিক পেছনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে তাপসকাকু আর আরো অনেকে।

—কি হয়েছে, কি হয়েছে এঘরে ?

এক মহিলা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, নতুন বৌয়ের গলা থেকে কে যেন নেকলেসটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ঠাকুরপো।

তাপসকাকু সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে একজনকে বলল, মন্টু, এক্ষুনি সদর দরজাটা বন্ধ করে দাও। একটা লোকও যেন এবাড়ি থেকে বেরুতে না পারে।

তাপসকাকুর কাছ থেকেই জানা গেল, ইলেকট্রিকের গোলমাল না, কে যেন মেইন-সুইচ্‌টা অফ্ করে দিয়েছিল। এবার নিশ্চিত-

ভাবে বোঝা যায়, নেকলেস চুরির ব্যাপারটা পূর্ব পরিকল্পিত। হঠাৎ আলো নিবে যাওয়াতেই কেউ সুযোগ বুঝে চুরি করেনি, চুরি করবে বলেই আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ততক্ষণে জয়ন্তকাকুরা এসে ঘরে ঢুকেছে। ঘরে যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে জয়ন্তকাকু বেশ গম্ভীর হয়েই বলল, এখন ঘর থেকে কেউ বেরুবেন না। থানায় ফোন করা হচ্ছে। পুলিশ এলে তাঁদের কথামতই যা করার করা যাবে।

পুলিশের কথায় তাপসকাকু কেমন যেন বিব্রত বোধ করে। একটু ইতঃস্তত করে বলে, আগে নিজেরাই খুঁজে দেখা যাক না। অমল-বাবু নিজেও একজন পুলিশ অফিসার। উনিও উপস্থিত আছেন। যাঁরা আজ এখানে এসেছেন তাঁরা সবাই আমার সম্মানীয় অতিথি। পুলিশ এলে সবাইকে হেনেস্থা করবে, সেটা আমার ভাল লাগছে না।

অমলবাবুও তাপসকাকুর এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

তারপর শুরু হল খোঁজার পালা।

ঘরের সব জায়গা ভাল করে খুঁজে দেখা হল। খাটের তল, আনাচ-কানাচ সব জায়গা।

তারপর জেরা করার জন্য বাড়ির ঠাকুর-চাকরদের একে একে ডাকা হল। কিন্তু কারো কাছ থেকেই সেরকম কিছু জানা গেল না। শুধু ভয় পেয়ে মানদা ঝি স্বীকার করল, কিছুক্ষণ আগে সিঁড়ির নিচে নতুন বৌয়ের গয়না নিয়ে কানাই ওকে কয়েকটা এদিক-ওদিক কথা বলেছিল।

অমলবাবু উৎসুক প্রশ্ন করেন, কি কথা ?

—কানাই আমাকে বলল, নতুন বৌয়ের গলার নেকলেসটা দেখেছিস ? কী জেল্লা ! যেন বাড়ি আলো করে দিচ্ছে। ও-রকম একটা পেলেই, মাইরি, আমাদের মত লোকের গোটা জীবনটা কেটে যায়। ভগবান মাইরি, যাদের আছে তাদেরই আরো বেশী করে দেয়।

—তুমি কি বললে ?

—আমি বললাম, অমন কথা বলিস না কানাই, কেউ শুনলে ভাববে, তুই লোভে পড়েছিস।

—তার জবাবে ও কি বলল ?

—ও বলল, চোর বাটপাড়দের আমি এক ফোঁটা দোষ দিই না, জানিস মানদা ? ভগবানের দয়ার পরোয়া করে না ওরা, নিজেদের হিম্মতের জোরেই আদায় করে নেয়।

এবার ডাক পড়ল কানাইয়ের। কানাই অনেক দিনের লোক বলে তাপসকাকু একটু বিব্রত বোধ করছিল, কিন্তু অমলবাবুর দিকে তাকিয়ে আর আপত্তি করতে পারে নি।

ইতিমধ্যে ঘরে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। কানাই সত্যিই অপরাধী কিনা কেউ সঠিকভাবে বুঝতে পারছিল না।

কানাই প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে ঢুকল।

তাপসকাকু খুব নরম-গলায় কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে অমলবাবু বললেন, একটু দাঁড়ান তাপসবাবু, আপনি এমন ভাবে শুরু করলেন, যেন ওকে প্রশ্ন করতে আপনি নিজেই লজ্জা পাচ্ছেন। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।

তারপর কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এ বাড়িতে কতদিন হয় কাজ করছ ?

কানাই মিন মিন করে বলল, বছর দশেক হবে, বাবু।

—মাইনে কত পাও ?

—ষাট টাকা।

—তোমার পরিবার কোথায় থাকে ?

—গ্রামের বাড়িতে।

—পরিবারে কে কে আছে ?

—আজ্ঞে, আমার ইস্তিরি আর চারটে ছেলে মেয়ে।

—বাড়িতে কত টাকা পাঠাও ?

—পঞ্চাশ টাকা করে পাঠাই।

—তাতেই সংসার চলে ?

—আমার বউও ওখানে কয়েক বাড়িতে ঠিকে কাজ করে বাবু। তাতেই কষ্টে-ছিষ্টে চলে যায়।

অমলবাবু একটু থেমে আবার জেরা শুরু করলেন।

—আচ্ছা, ধর তুমি যদি হঠাৎ কোনখান থেকে, বা লটারীতে কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাও, তাহলে সে টাকা দিয়ে কি করবে তুমি?

কানাই বলল, দেশে ফিরে গিয়ে কিছু জমি-জমা কিনে, ছোট্ট একটা বাড়ি করে, বউ ছেলে-মেয়েদের একটু সুখে রাখার চেষ্টা করতাম বাবু।

—সেটা হচ্ছে না বলে নিশ্চয়ই তোমার মনে একটা দুঃখ আছে?

—কোন্ বাবার তা না থাকে বাবু?

—চোর বাটপাড়রা নিজেদের হিম্মতের জোরে অন্যের কাছ থেকে টাকা আদায় করে সুখে থাকে বলে তাদের দেখে হিংসে হয় তোমার?

কানাই এবার বুঝতে পারে, জেরাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে।



কাঁপা গলায় বলে, না বাবু, চুরি-চামারির টাকায় কোন সুখ নেই। সবাই তাদের ঘেন্না করে।

অমলবাবু ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, তাই বুঝি? কিন্তু কিছুক্ষণ আগে মানদাকে তুমি বলনি—

কানাই আচমকা পা জড়িয়ে ধরে অমলবাবুর। কেঁদে ফেলে বলে, বিশ্বেস করুন, আমি কিছু ভেবে বলিনি বাবু। এমন একটা ঘটনা ঘটবে জানলে ও-কথা আমি মুখেও আনতাম না।

অমলবাবু বললেন, এ-ঘরে তুমি শেষ কখন এসেছিলে?

কানাই বলল, আমি নিচে নানা কাজে ছুটোছুটি করছি বাবু, ওপরে আসার সময় পাইনি।

এক ভদ্রমহিলা বললেন, কিন্তু ঘটনাটা ঘটবার কিছুক্ষণ আগে ওকে আমি ঐ জানলাটার কাছে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি।

কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে অমলবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কথাটা সত্যি?

এবার কেমন যেন থতমত খেল কানাই। বলল, ও, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম বাবু। একবার মাত্র এসেছিলাম।

কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন অমলবাবু, কেন?

—ঐ···ইয়ে···একটা কাজ সেরে এই ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একবার থেমে—

—নতুন বউয়ের গলায় নেকলেসটা আছে কিনা লক্ষ্য করে গিয়েছিলে, না?

এবার চাপা চীৎকার করে ওঠে কানাই, না বাবু। বিশ্বেস করেন, আমি—

ওর কথা শেষ হবার আগেই তাপসকাকুর দিকে তাকিয়ে অমলবাবু বললেন, আমার যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি তাপসবাবু। চোর-বাটপাড় নিয়েই আমাদের কারবার। ঠিকমত দাওয়াই পড়লে এর পরের টুকুও আপ্‌সেই স্বীকার করবে। কাজটা ও নিজের হাতে না করলেও ও যে দলের ভেতর ছিল সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু, আমি নিজে একজন পুলিস অফিসার হলেও এখানে আমার কিছু করার

অধিকার নেই। ওকে এখানে আটকে রাখুন, আমি থানা থেকে পুলিস ডেকে নিয়ে আসছি।

কানাই এবার হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে তাপসকাকুর পা জড়িয়ে ধরল।

—আমাকে বাঁচান বাবু। বিশ্বেস করুন, আমি কিছু জানিনা। গয়নাটা আমি নিইনি।

অমলবাবু বীরদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আস্তে ডাকে পিকলু, একটু দাঁড়ান অমলবাবু।

অমলবাবু একটু অবাক হয়ে ফিরে তাকান।

পিকলু জয়ন্তকাকুর দিকে তাকিয়ে বলল, পুলিশ ডাকার আগে এ ঘরে তখন যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সবাইকে একবার সার্চ করে নিলে ভাল হত না, কাকু?

মা একটু বিরক্ত হয়েই ধমক দেয় পিকলুকে, ছিঃ, পিকলু, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এর ভেতর নাক গলাচ্ছ কেন?

অমলবাবুও চাপা বিরক্তি নিয়ে বললেন, তাছাড়া শুনলে তো, অতিথিদের সম্মান রক্ষার জন্য তাপসবাবু পুলিশ পর্যন্ত ডাকতে চাইলেন না।

মুহূর্তের জন্য একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পিকলুকে দেখে নিয়ে জয়ন্তকাকু বলল, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, পিকলুবাবুর মাথায় কোন প্ল্যান এসেছে। তা, সার্চ করলেই বা আপত্তি কি? আমরা সবাই বরং তাতে স্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করব। সত্যি কথা বলতে কি, এসব ক্ষেত্রে সবাই একটা সঙ্কোচের ভেতর পড়ে। ভাবে, আর সবাই বোধহয় আমাকেই সন্দেহ করছে।

অমলবাবু সামান্য বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, ওটা একটা ফল্‌স ভ্যানিটি! এখানে যারা আছেন তাঁদের কাউকে দেখেই, আমি যে পুলিসের লোক, আমারও কোন সন্দেহ হচ্ছে না। ঠিক আছে, আপনারা বরং দেখুন, বাড়ি থেকে কেউ যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। আমি পুলিশ ডেকে আনছি, সার্চ করতে হলে তারাই এসে করবেন।

পিকলু বলল, সবার আপত্তি থাকলে আমি অবশ্য কিছু বলছি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল—

জয়ন্তকাকু হেসে বলল, ঠিক আছে, আমাদের ক্ষুদে গোয়েন্দাটির যখন একটা সন্দেহই হচ্ছে, দেখাই যাক না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিন্তু কোন আপত্তি নেই এতে। আমাকে দিয়েই না হয় শুরু কর পিকলু, এই আমি হাত তুলে দাঁড়ালাম।

পিকলু বলল, তার আগে তাহলে তুমি আমাকে একবার সার্চ করে দাও কাকু।

—ঠিক আছে, এস।

জয়ন্তকাকু এগিয়ে আসে। ওর জামা আর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রুমাল বের করে বলে, নাঃ, কিছু নেই, শুধু এই রুমালটা ছাড়া।

পিকলু নির্লিপ্ত সুরে বলল, রুমালটা আমার না, অমলবাবুর।

অমলবাবু হেসে বললেন, আরে, ওটা তাহলে তুমি কুড়িয়ে পেয়েছ? আমি অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছিলাম। ভাবলাম, কোথায় ফেললাম!

জয়ন্তকাকু বলে, কই, এবার আমাকে সার্চ কর।

অমলবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পিকলু বলে, আরে আপনি কোথায় চললেন অমলবাবু? ঠিক আছে, আপনার তাড়া থাকলে আপনাকেই বরং আগে সেরে নিচ্ছি।

এবার রেগে ধমকে ওঠেন অমলবাবু, থাম তো ছোকরা! আমি পুলিশের লোক, বসে বসে এসব ছেলেখেলা দেখার সময় নেই আমার। চোখের সামনে এরকম একটা থেপ্ট কেস্ দেখেও—

পিকলু হালকা সুরে বলল, তা অবশ্য ঠিক, আপনাদের বিবেকে লাগে। ঠিক আছে, জয়ন্তকাকু, অমলবাবুর ডান পায়ের মোজার ভেতরটা শুধু একবার দেখে নিয়ে ওঁকে থানায় যেতে দাও বরং।

এবার উত্তেজনায় চীৎকার করে ওঠেন অমলবাবু, থাম, ডেঁপো ছোকরা কোথাকার! নিমন্ত্রিতদের এভাবে অপমান করবার অধিকার—

কিন্তু জয়ন্তকাকু ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে, পিকলু ছেলেমানুষি করে

এসব কথা বলছে না। এর পেছনে নিশ্চয়ই গভীর কোন তাৎপর্য আছে।

অমলবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলে তাই, দাঁড়ান মশাই, বলছে যখন একবার দেখেই দিই না।

ঘরের সবাই তখন বিব্রত, স্তম্ভিত। অমলবাবুও তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। বাধা দিতে শুরু করেন। কিন্তু তার ভেতরই জয়ন্ত বসে পড়ে ওঁর প্যান্টের পাটা তুলে মোজাটা দেখে চমকে ওঠে। মোজা থেকে টেনে বের করে—নতুন বৌয়ের হারানো নেকলেস!

সবাই দেখে তাজ্জব। বিস্ময়ে কারো মুখে আর কোন কথা নেই। পিকলু একটু হেসে বলে, এবার থানায় খবর দিতে পার, কাকু।

জয়ন্ত বলল, তা দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে তুই বলতো, কি করে বুঝতে পারলি ব্যাপারটা ?

পিকলু এবার বেশ পাকা গোয়েন্দার গাম্ভীর্য নিয়ে বলতে শুরু করে, এটা বেশী ডিটেকটিভ বই পড়ারই দোষ বলতে পার, কাকু, নতুন কারো সঙ্গে আলাপ হলেই আমি তাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। অমলবাবু শিলং-এ থাকেন এবং সেখান থেকে এসেছেন শুনেই আমার একটা হিসেব গোলমাল হয়ে যায়।

—কেন ?

—শীতপ্রধান দেশের লোকের গায়ের রঙের সঙ্গে ওঁর গায়ের রঙ মিলছিল না। অমলবাবুকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, উনি কোন সমুদ্র ঘেঁষা জায়গায় কিছুদিন কাটিয়ে এসেছেন।

—তারপর ?

—তারপরই সন্দেহ হল ওঁর কথাবার্তা শুনে।

—কেন ?

—সাধারণতঃ পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগে যারা কাজ করেন তাঁরা একটু চাপা স্বভাবের হন। নিজেদের পরিচয়টা যত্র-তত্র ঘোষণা করে বেড়ান না। কিন্তু উনি সুযোগ পেলেই সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন, যে উনি পুলিশ অফিসার।

ঘরের সবাই রুদ্ধশ্বাসে পিকলুর কথা শুনছিল। পিকলু একটু থেমে আবার শুরু করে।

—তোমার সিগারেটের ব্যাপারটায় তোমরা যখন আমার গোয়েন্দা-গিরির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলে, আমি লক্ষ্য করলাম, অমলবাবু কেমন যেন সতর্ক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

জয়ন্ত বলল, কিন্তু এই চুরির ব্যাপারটায় ওঁকে সন্দেহ করতে শুরু করলে কখন থেকে ?

—মা যখন নতুন কাকীমাকে উপহার দিচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, অমলবাবু জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটু যেন সন্ত্রস্ত হলেন। অবশ্য তখন আমি ভেবেছিলাম, মহিলাদের ঘরের সামনে এসে পড়েছিলেন বলেই বোধহয় লজ্জা পেয়েছেন।

—তারপর ?

—একটু পরেই গোটা বাড়ির আলো নিবে গেল। ঘরের ভেতর হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। আমি মেয়েদের এ পাশটায় দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ পায়ে ভারী একটা জুতোর চাপ পড়ল। আমি যন্ত্রণায় চাপা চীৎকার করে উঠেছিলাম। বেশ বুঝতে পারলাম, কোন পুরুষ মানুষের জুতো সেটা। কিন্তু বুঝলাম না, এই গোলমালের ভেতর, লোকটি যেই হোক, তার এমন হন্তদন্ত হয়ে মেয়েদের ঘরে ঢোকার কি দরকার পড়ল। ঠিক তক্ষুনি নতুন কাকীমা চীৎকার করে উঠলেন, আমার নেকলেসটা যেন কে নিয়ে গেল !

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে পিকলু, ঠিক তক্ষুনি আমাকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই কে যেন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি টলে পড়তে গিয়েও কোন রকমে সামলে নিলাম। বোধ-হয় লোকটার সার্টটাই মুঠো করে ধরেছিলাম নিজেকে সামলানোর জন্য। লোকটা চলে গেলেও ওর পকেটের রুমালটা আমার হাতে উঠে এসেছিল। একটু পরেই আলোটা জ্বলে উঠল। রুমালটা দেখেই আমি চিনতে পারলাম, ওটা অমলবাবুর রুমাল। ওঁর হাতে একবার রুমালটা

দেখেছিলাম আমি। একটা কট্‌কী রুমাল। আর তক্ষণি আমি বুঝতে পারলাম, নেকলেসটা কে নিয়েছে।

জয়ন্তকাকু বলল, কিন্তু নেকলেসটাকে যে উনি মোজার মধ্যেই রেখেছেন সেটা বুঝলি কি করে ?

পিকলু বলল, অমলবাবু তোমাদের সঙ্গে যখন চেয়ারে বসে গল্প করছিলেন, তখন একবার উনি এক পায়ের ওপর আর এক পা তোলায় আমার হঠাৎ চোখে পড়েছিল, ওঁর মোজাটা হাফ না, বেশ মোটা আর বড়—মানে, আগেকার দিনের মত হাঁটু সমান মোজা। কলকাতার এই গরমে ওঁকে ওরকম একটা মোজা পরে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়েছিলাম। এই ঘটনাটা ঘটার পর হঠাৎই আমার মাথায় ফ্ল্যাশ করল, নিশ্চয়ই নেকলেসটা লুকিয়ে ফেলার জন্যই ঐ মোজা।

জয়ন্তকাকু বলল, বুঝলাম, কিন্তু ডান পায়ের মোজাতেই যে রেখেছেন, সেটা কি করে বুঝলি ?

পিকলু বলল, ডান হাত দিয়ে কোন জিনিস দ্রুত লুকোতে হলে ডান পায়ের মোজাতে লুকোনটাই সুবিধাজনক বলে।

এতক্ষণে তাপসকাকু বলল, কিন্তু কানাইকে তোর সন্দেহ হল না কেন, পিকলু ?

পিকলু বলল, দুটো কারণে। প্রথমতঃ, যারা চুরি করে তারা কখনও তড়পায় না। আর, দ্বিতীয়তঃ, ওর জানলার কাছে ঘুরঘুর করার কারণটা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম।

—কারণটা কি ?

একটু হেসে বলল পিকলু, তুমি বোধ হয় কোন সময় ভুলে ঐ জানলার তাকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট ফেলে গিয়েছিলে কাকু। তোমাদের শ্রীমান কানাই সেটাই হাপিজ করার তালে ছিল। তাই না কানাই ?

কানাই এতক্ষণে সাহস পেয়ে বললে, হ্যাঁ, বাবু, তাই। আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এক্ষুনি ওটা ফেরত দিয়ে যাচ্ছি বাবু।

তাপসকাকু একটু হেসে বলল, দরকার নেই, ওটা তোকেই উপহার দিলাম। এবার যেতে পারিস তুই।

জয়ন্তকাকু তাপসকাকুকে বলল, তাপস, এবার তুই নিশ্চিন্ত মনে থানায় যেতে পারিস। অমলবাবুকে নিয়ে এধারে অপেক্ষা করছি আমরা।

অমলবাবু তখন দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে বসেছিলেন।

আর পিকলু? রাতারাতি উপস্থিত সবার কাছ থেকে নতুন একটি খেতাব পেয়ে গেল সে—ক্ষুদে গোয়েন্দা। ক্ষুদে গোয়েন্দা পিকলু।



নেকলেসের ঘটনাটার পর, তা প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। এখনও মাঝেমাঝে মনে হয় পিকলুর, কি করে অমন জটিল একটা সমস্যার অত সহজ সমাধান করে দিতে পেরেছিল সেদিন !

উত্তরটা অবশ্য পরে নিজেই খুঁজে পেয়েছে। প্রচুর ডিটেকটিভ বই পড়ায় পর্যবেক্ষণ শক্তি বা রহস্য উন্মোচনের সূত্রগুলো ওর অজান্তেই ওর মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেগুলো প্রকাশ পায়নি সুযোগের অভাবে। সেদিন আচমকা সুযোগটা এসে যাওয়ায় বইয়ে-পড়া অভিজ্ঞতাগুলোই ওকে সাহায্য করেছিল রহস্য উন্মোচনের সূত্রগুলো এগিয়ে দিয়ে। যেজন্য প্রবাদই আছে, বিপদে পড়লে লোকের বুদ্ধি খোলে। অবশ্য ভাল রহস্য-সন্ধানী হতে গেলে বুদ্ধিটা শুধু বিপদে পড়ার জন্য জিইয়ে রাখলেই হয় না, সবসময় সজাগ রাখতে হয়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস এবং দ্রুত সিদ্ধান্তে আসার ক্ষমতাই রহস্য-সন্ধানীর সবচেয়ে বড় গুণ।

একথা যে কত সত্য সেটা বুঝতে পারল পিকলু ক'দিন পরের একটি ঘটনায়।

বাবার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিদেশ যাচ্ছিলেন। মা-বাবার কথা ছিল ওঁকে বিদায় জানাতে বিকেলে দমদম এয়ারপোর্ট যাবার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মা বাবাকে বলল, তুমি বরং একাই ঘুরে এস। পিকলু পিউকে একা বাড়িতে রেখে যেতে মন চাইছে না।

বাবা বলল, একা কেন হবে? বাড়িতে তো ভোম্বলই থাকছে। ও পুরোন দিনের বিশ্বাসী লোক, ওর কাছে রেখে যেতে ভয় পাচ্ছ কেন?

মা একটু আমতা আমতা করে বলল, ভয় না, তবু—

পিকলু বারান্দায় বসে বই পড়ছিল। এবার উঠে এসে ভারিক্কি চালে বলল, তুমি সব কিছুতেই এমন ভয় পাও কেন বলতো, মা। আমরা কি এখনও বাচ্চা আছি নাকি? তাছাড়া ভোম্বলদাই তো থাকছে বাড়িতে। তোমরা বাড়িতে না থাকলে ভোম্বলদা তোমাদের চেয়েও কড়া গার্জিয়ান বনে যায়, জান? তুমি না গেলে কাকু-কাকীমা মনে দুঃখ পেতে পারে।

মা মুচকি হেসে বলল, একেবারে বীরপুরুষ হয়ে উঠেছিস, না? তাও যদি বুঝতাম স্কুলের গণ্ডীটা পেরিয়েছিস! এখনও নাক টিপলে দুধ গলে—

পিকলু সামান্য ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে, ছেলেমেয়েদের তোমরা ঐ করেই বড় হতে দাও না মা।

বাবা ওকে উৎসাহ দিয়ে হেসে বলল, কারেক্ট! 'পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে, রাখিও না বেঁধে আর ভাল ছেলে করে'।—তাই না পিকলু?

মা কপট ধমকের সুরে বলল, থাক, ওকে আর উস্কোতে হবে না তোমার।

শুধু পিকলুর কথায় নয়, ভোম্বলদাও আশ্বাস দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছিল মা। যাওয়ার আগেও বারে বারে সাবধান করে দিয়েছিল

পিকলুদের, ওঁরা না ফেরা পর্যন্ত বাইরে কোথাও যেন না যায়। শান্ত হয়ে থাকে।

কিন্তু মা কি তখন জানত, ওরা বাইরে না গেলেও বিপদ বাইরে থেকে এসে ভেতরে ঝাপিয়ে পড়তে পারে !

মা যাই বলে যাক, মা-বাবা বেরিয়ে যেতেই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে পিকলু, পিউ। মা-বাবা বাড়ি না থাকলে ভোম্বলদাকে কে আর পাত্তা দেয় !

প্রথমেই হুই ভাইবোনের লেগে গেল রেডিও আর রেকর্ড নিয়ে। পিউ বলে রেকর্ড চালাবে। নতুন ছড়া-গানগুলো শুনবে বসে বসে। পিকলু বলে, কিছুতেই না। ও রেডিওর বিবিধ ভারতী শুনবে।

ওদের থামাতে ছুটে আসতে হয় ভোম্বলদার। এসে ধমক দেয় ওদের। কিন্তু পাত্তা দেয় না ওরা। তখন বোঝানোর চেষ্টা করে। তাতেও কোন ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে নতুন একটা পথ বাতলায় ভোম্বলদা, হয় হুটোই এক সঙ্গে চলুক, না হয় হুটোই বন্ধ থাক।

অবশেষে টস্ করে ঠিক করে নেয় হুজনে, কোনটা চলবে ! টসে পিউ জেতে। ছড়া গানই শুরু হয় রেকর্ডে।

নিজের ঘরে গিয়ে একটা ডিটেকটিভ বই নিয়ে শুয়ে পড়ে পিকলু। কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখে, মাঝখানের কটা পাতা নেই। মেজাজ খিঁচড়ে যায়। বইটা নিয়ে উঠে গিয়ে ভোম্বলদাকে বলে, ভোম্বলদা, লাইব্রেরী থেকে এই বইটা একটু বদলে আন তো ?

ভোম্বলদা কিছুতেই রাজী হয় না।—তা কি করে হবে ? তোমাদের একা বাড়িতে রেখে আমি যেতে পারব না।

পিকলু ধমকে ওঠে, একা একা করছ কেন ? আমি আর পিউ হুজনেই তো আছি।

ভোম্বলদা বিজ্ঞের মত বলে, হুটো বাচ্চাকে একাই বলে।

পিকলু আরো চটে যায়। বলে, তোমার আর গার্জিয়ানগিরি

ফলাতে হবে না। আমরা মোটেই বাচ্চা নই। এই সেদিন স্কাউটদের সঙ্গে সাউথ ইণ্ডিয়া ঘুরে এলাম আর উনি আমাকে বলছেন বাচ্চা।

ভোম্বল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, সে তুমি ঐ কি বললেন—সাথ ইণ্ডি না কি—তাই ঘোর আর বিলেতই ঘোর, বাচ্চা বাচ্চাই।

পিকলু বোঝে, ধমকে কিছু হবে না। তাই কৌশল পাল্টায়। তোয়াজ শুরু করে। চলতি কথায় যাকে বলে গ্যাস দেওয়া।

পিকলু তখন উল্টো গ্যাস দেবার জন্য বলল, তুমি এমন করছ কেন ভোম্বলদা? তুমি একটু আধটু পড়তে পার বলেই তো তোমাকে বলি, না হলে তো উল্টো ফ্ল্যাটের মুন্নাকেই পাঠাতে পারতাম। বললেই ছুটে যেত। কিন্তু ও ব্যাটা তো আকাট মুখ্যু। তাছাড়া, একা কোথায়, বল। এই তো সবে সন্ধ্যা। চারদিকে লোকজন গিসগিস করছে। আমরা দরজা দিয়ে দুই ভাই বোন থাকব এতে ভয়ের কি আছে। লোকে শুনলে বলবে, তুমি আমাদের কোলে-পিঠে করে মানুষই করেছ, কিন্তু তোমার মত সাহসী করে তুলতে পার নি আমাদের। তাহলে আর তোমার হাতে মানুষ হয়ে কি লাভ হল বল? সে তো তোমারই নিন্দা।

কথাটা বোধ হয় মনে ধরে ভোম্বলের। বারে বারে ওদের সাবধানে থাকতে বলে বইটা নিয়ে লাইব্রেরী রওনা হয়। যাবার সময় অভয় দিয়ে যায় পিকলুকে, নিজেই দেখে-শুনে একটা বই নিয়ে আসবে। লাইব্রেরীবাবু জোর করে কোন খারাপ বই গছিয়ে দিলেও তা আনছে না সে।

গ্রামোফোনে তখন পুরোদমে ছড়াগান চলছে। হঠাৎ দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে। মনে যতই সাহস দেখাক, একা বাড়ি থাকলে কে ডাকছে তা না দেখে দরজা খোলে না পিকলু।

পিপ-হোল দিয়ে দেখল বাইরে একটি অপরিচিত যুবক দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন উত্তেজিত চেহারা।

পিকলু ভেতর থেকেই বলল, কাকে চান?

যুবকটি চাপা উত্তেজিত স্বরে বলল, তোমাদের বাড়ি ফোন আছে

শুনলাম, আমার বাবা হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ষ্ট্রোক। আমাদের ফ্যামিলি-ফিজিসিয়ানকে এক্ষুনি একবার ফোন করতে হবে ভাই। দরজাটা একটু খুলবে ?

পিকলু একটু দ্বিধায় পড়ে। বলে, বাড়িতে কেউ নেই, আপনি মোড়ের মাথায় ওষুধের দোকানটা থেকে ফোন করুন না ?

যুবকটি বলল, ওদের ফোনটা আউট অফ অর্ডার। ওঁরাই তোমাদের বাড়ির কথা বললেন। আমি আর দেরী করতে পারছি না ভাই। হঠাৎ একটা কিছু হয়ে-টয়ে গেলে কিন্তু তুমি নিজেই লজ্জা পাবে। বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। একটা ফোন, এর ভেতর এত চিন্তা-ভাবনার কি আছে ?

কথাটা উড়িয়ে দিতে পারে না পিকলু। সত্যিই পরে ভাল-মন্দ একটা কিছু ঘটে গেলে বন্ধুদের কাছে মুখ দেখান যাবে না। বন্ধুদের কেউ বাড়িতে ফোন থাকতেও পাড়ার একজনকে এত বড় বিপদের সময় ফোন করতে দেয় নি শুনলে পিকলুও তাকে ধিক্কার দিত।

আস্তে দরজাটা খুলে দেয় তাই পিকলু।

যুবকটি ঘরে ঢুকেই আচমকা আস্তিনের তল থেকে একটা ছোরা বের করে ওদের সামনে ধরে। বাঁ হাতে দরজার ছিটকানিটা লাগিয়ে দেয়।

ছোরাটার দিকে তাকিয়ে মনেমনে আঁতকে ওঠে পিকলু। ছোরাটার গায়ে এখনও রক্তের দাগ।

গান থামিয়ে পিউও এসে দাদার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। পিকলু একটু এগিয়ে বোনকে আড়াল করে দাঁড়ায়। ওর মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে, এ, এ-কি করছেন ?

যুবকটি ছোরাটা ওদের সামনে ধরে রেখেই বলল, শোন, তোমাদের কোন ভয় নেই। আমাকে পুলিশ তাড়া করেছিল। তাড়া খেয়ে এ পাড়ায় ঢুকে পড়েছিলাম। পুলিশ নিশ্চয়ই এপাড়াটা খুঁজবে এবার। আমার একটা শেল্টার দরকার।

ভয়ে পিকলুর ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। তবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস

করে, আপনি কি কাউকে খুন করে এসেছেন।

যুবকটি বলল, না, মরেনি বোধহয়। একজনের ওপর বদলা নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

পিকলু করুণ স্বরে বলল, দয়া করে আপনি চলে যান। পুলিশ এসে আপনাকে এখানে খুঁজে পেলে আমাদের পর্যন্ত—

যুবকটি কড়া সুরে বলল, যাতে খুঁজে না পায় সে ব্যবস্থাই তোমাদের করতে হবে। এই মেয়েটা তোমার বোন?

—হ্যাঁ।

—তোমার মা-বাবা কোথায়?

—দমদম এয়ারপোর্টে একজনকে বিদায় জানাতে গিয়েছেন।

—বাড়িতে বোধহয় চাকর-বাকর নেই?

—আছে একজন। একটু আগে লাইব্রেরীতে গেল বই পাল্টাতে।

যুবকটি একটু হেসে বলল, বাঃ ফাইন!

তারপর চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, শোন, পুলিশ খুঁজে-টুজে এপাড়া থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঐ ছোট ঘরটায় আছি। শুধু আমি না, তোমার ঐ ছোট বোনটিও আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি যদি ফোন করে বা অন্য কোনভাবে আমাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা কর, তাহলে কিন্তু তোমার বোনকে ফিরে পাবে না। স্রেফ খুন করে ফেলব ওকে। বাইরের কেউ হঠাৎ চলে এলেও বুদ্ধি করে তাদের ম্যানেজ করবে।

বিপদের গুরুত্বটা এবার পুরো বুঝতে পারে পিকলু। আস্তে বলে, পুলিশ এলে?

—বলবে, এখানে কেউ আসেনি।

—যদি সার্চ করে। সার্চ করে আপনাকে বের করে ফেলে?

যুবকটি একটু ভেবে বলল, তাহলে অবশ্য তুমি দায়ী থাকবে না। সে ক্ষেত্রে তোমার বোনেরও কোন ক্ষতি করব না আমি। কিন্তু যদি টের পাই যে তোমার দিক দিয়ে কোন গাফিলতির জন্য ধরা পড়েছি—

বোনের দিকে আড়চোখে একবার তাকায় পিকলু! ভয়ে পিউয়ের

ঠোঁট দুটো কালো হয়ে গেছে। আস্তে যুবকটিকে বলল ও, না, আমি আপনাকে ধরিয়ে দেব না।

পিউয়ের হাত ধরে যুবকটি সামনের ছোট্ট ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। বলে, এস।

ভয়ে এবার কেঁদে ফেলে পিউ।

যুবকটি ধমকের সুরে বলে, ভয় পাচ্ছ কেন? বললাম না, কোন ভয় নেই। ভাল চাও তো এস আমার সঙ্গে।

পিকলুও বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলে, যা ওঁর সঙ্গে। ভয় নেই। আমিই তো থাকছি এ ঘরে। উনি কথা দিয়েছেন, কিছু বলবেন না তোকে।

ঘরটায় ঢুকে একবার চারদিকটা ভাল করে দেখে নেয় যুবকটি। তারপর পিকলুর দিকে তাকিয়ে বলে, ঘরে আয়োডিন বা ডেটল আছে? হাতটা কেটে গেছে দেখছি।

এতক্ষণে লক্ষ্য করে পিকলু, ওর কব্জির কাছে বেশ কিছুটা কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। জামার হাতায় ঢাকা থাকায় এতক্ষণ নজরে পড়েনি।

আস্তে বলল পিকলু, আছে। ডেটল।

—তাহলে শিশিটা আর একটু তুলো নিয়ে এস তো।

নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় পিকলু। একটু পরে ডেটল আর তুলো নিয়ে ফিরে আসে।

যুবকটি বলল, ব্যাস, তুমি এবার ও ঘরে যেতে পার। কিন্তু মনে রেখ, এ-ঘর থেকে ও-ঘরের সব কথা শুনতে পাব আমি। কোন রকম বেইমানির চেষ্টা করলে···

আস্তে বলল পিকলু, আমি কাউকে বলব না।

দাদাকে বেরিয়ে যেতে দেখে ডুকরে কেঁদে ওঠে পিউ। পিকলু ঘুরে দাঁড়ায়। পিউয়ের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে ধমকে ওঠে যুবকটি। বলছি কাঁদবে না, তোমার কোন ভয় নেই। কাঁদলে এই ছোরাটা দেখছ তো? দেব খতম করে।

ভয়ে থেমে যায় পিউ! নিঃশব্দে হেঁচকি উঠতে থাকে মাঝে মাঝে।

পিকলু আস্তে বলে, তোর কোন ভয় নেই পিউ।

—পিউ! নামটা জব্বর তো!

ঠাট্টা না প্রশংসা বুঝতে পারে না পিকলু। পিকলুর দিকে ফিরে আদেশের সুরে বলল যুবকটি, ও ঘরে গিয়ে রেডিওটা হালকাভাবে চালিয়ে রাখবে, না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। যা যা বললাম সব মনে রাখবে। যাও।

পিকলু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয় যুবকটি।

ও-ঘরে পিউ গুণ্ডাটার থাবার ভেতর একেবারে একা। বোনের কথা ভাবতেই ভয়ে বুকটা শুকিয়ে যায় পিকলুর। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। বাড়িতে এক খুনে গুণ্ডা অথচ কাউকে ডাকার উপায় নেই। কিছু বলার উপায় নেই। কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারে না পিকলু। প্রচণ্ড নার্ভাস বোধ করে।

রেডিওটা হালকাভাবে চালিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বসে ভাবছিল পিকলু। পুরো ঘটনাটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ দরজার কলিং-বেলটা বেজে ওঠে।

ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে পিকলুর। পুলিশ না তো?

না। দরজার পিপ-হোল দিয়ে দেখে, দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ভোম্বলদা।

কি করবে বুঝতে পারে না পিকলু। দরজা খুললেও বিপদ। ভোম্বলদা এসে ঠিক টের পেয়ে যাবে ব্যাপারটা। চীৎকার চেঁচামেচি শুরু করবে। অথচ না খুললেও আর এক বিপদ। কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ভেবে আরো হৈ-চৈ করবে। পাড়ার লোক ডেকে জড়ো করবে।

অগত্যা আস্তে দরজা খুলে দরজার মুখ আগলে দাঁড়ায় পিকলু।

হাতের মোটা বইটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলে ভোম্বল, তোমার না-পড়া ভাল বই কিছু পেলাম না। তাই এই রামায়ণটা নিয়ে এলাম।

পড়ে দেখ, অনেক কিছু শেখার জিনিস আছে এতে।

মোক্ষম একটা সুযোগ পেয়ে যায় পিকলু। রাগে ফেটে পড়ে ভোম্বলের ওপর। এক্ষুণি বইটা আবার বদলে আনতে পাঠায়। আর ফেরার পথে ওর বন্ধু কুশলের কাছ থেকে ওর ইতিহাস বইটা একটু নিয়ে আসতে বলে। তবু যতটা সময় ভোম্বলদাকে বাইরে রাখা যায়।

ওর রাগ দেখে বোধ হয় একটু থতমত খেয়ে যায় ভোম্বলদা। বিনা প্রতিবাদে আবার বইটা পাল্টে আনতে যায়। দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দেয় পিকলু।

ওঘর থেকে যুবকটির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।—থ্যাঙ্ক ইউ ব্রাদার!

এটাও প্রশংসা না ঠাট্টা ঠিক বুঝতে পারে না পিকলু। নিঃশব্দে আবার এসে রেডিওটার সামনে বসে পড়ে।

আবার শুরু হয় ভাবনা। কি করবে? কি করা উচিত? ডিটেকটিভ বই গুলে-খাওয়া পিকলুর মাথায়ও কোন উপস্থিত বুদ্ধি খেলে না।

আবার দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে। আবারও বুকটা কেঁপে ওঠে পিকলুর। কে এল?

পিপ-হোলে উঁকি দিয়ে দেখল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জয়ন্তকাকু আর কাকীমা। এ আর এক সমস্যা। ওঁদের ভেতরে এসে বসতে বললে একটু বাদেই পিউয়ের খোঁজ পড়বে। পিকলুর চোখ-মুখ দেখেও কিছু সন্দেহ করতে পারে। তাই দরজার মুখ থেকেই ওঁদের বিদায় দেওয়ার জন্য দরজাটা সামান্য ফাঁক করে খুলে বলল পিকলু, কাকু, মা-বাবা কেউ বাড়িতে নেই। দমদমে গেছে। ওরা এলে বলে দেব'খন যে তোমরা এসেছিলে।

কিন্তু কৌশলটা কাজে লাগে না। আমোদী জয়ন্তকাকু ভেতরে ঢুকে আসতে আসতে অবাক হয়ে বলে, সে কি রে! বাড়িতে তোরা একা? বৌদির দারুণ উন্নতি হয়েছে তো!

কাকীমা একটু হেসে বলল, কতক্ষণ হয় গেছে? ফেরার সময় হয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় পিকলু, না, ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে।

জয়ন্তকাকু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, বুড়িটা কই? বুড়িটাকে দেখছি না যে?

অর্থাৎ, পিউ। ঝটপট জবাব দেয় পিকলু, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কাকীমা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে আর বসে কি হবে? চল?

ওদের তাড়ানোর জন্য ব্যস্ত পিকলু। চাপা উৎসাহের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ কতক্ষণ আর বসবে। ওঁরা ফিরলে আমি বলে দেব'খন।

দরজার মুখে এসে হঠাৎ মনে পড়ায় জয়ন্তকাকু বলে, আচ্ছা পিকলু। আমরা কাল তোদের এখানে কোন ওষুধ ফেলে গেছি? মা বাবার মুখে শুনেছিস কিছু?

পিকলু বলে, ওষুধ?

—ঐ মার জন্য একটা ঘুমের ওষুধ কিনেছিলাম। কোথায় যে ফেললাম। অবশ্য এখান থেকে বেরিয়ে আরো তিন চার জায়গা হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম আমরা।

ব্যস্ত হয়ে বলে পিকলু, মা-বাবা এলেই আমি জিজ্ঞেস করব'খন। পেলে তোমাকে ফোন করে আজকেই জানিয়ে দেওয়া যাবে।

জয়ন্তকাকু আর কাকীমা বেরিয়ে যেতেই সন্ত্রস্তভাবে দরজাটা বন্ধ করে দেয় পিকলু। ভেতরে-ভেতরে তখন ঘামতে শুরু করেছে ও।

ওঘর থেকে আবার স্বর ভেসে আসে, সাবাস ভাই।

একটু বাদেই আবার কলিংবেল। এতক্ষণ যা ভয় করেছিল, তাই। এবার পুলিশ। একবারেই দরজা খুলে দেয় পিকলু। আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে শক্ত রাখে।

দু'জন জাঁদরেল চেহারার পুলিশ অফিসার গম্ভীর মুখে ভেতরে আসেন। পেছনে জন কয়েক পুলিশ।

চারদিকে একবার অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রথম অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িতে আর কে আছেন?

মিন মিন করে বলে পিকলু, আর কেউ নেই। আমি একা।

—তোমার বাবা-মা।

—দমদমে গেছেন, এক বন্ধুকে প্লেনে তুলে দিতে।

—কোন কাজের লোক-টোক !

মাঝ পথেই বলে পিকলু, বাইরে গেছে একটা জরুরী কাজে।

—হুঁ !

দ্বিতীয় অফিসার প্রশ্ন করেন এবার, এদিকে একটা লোককে আসতে দেখেছ খোকা ? রোগা ছিপছিপে চেহারা, কালো মতন।

বুক ঢিপ ঢিপ করছে পিকলুর। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক থেকে বলে, কই, না তো !

হঠাৎ মেঝের দিকে একটু ঝুকে পড়ে প্রথম অফিসার বলেন, মেঝেতে ঐ রক্তের ফোঁটাটা কিসের ?

বুকটা ধড়াস করে ওঠে পিকলুর। সামলে নিয়ে বলে, ঐ···ইয়ে··· আমাদের বাড়িতে যে লোকটা কাজ করে, রুটী কাটতে গিয়ে ওর আঙুলটা হঠাৎ—

গম্ভীর গলায় অফিসার বলেন, সে কোথায় ?

—ডাক্তারখানায় গেছে। ওষুধ লাগিয়ে আসতে। ঘরে কোন ওষুধ ছিল না কিনা।

দ্বিতীয় অফিসার বাতাসে গন্ধ টেনে বলেন, কিন্তু ডেটলের গন্ধ পাচ্ছি যেন ?

সঙ্গে সঙ্গে বলে পিকলু, একটু ছিল। সেটুকুতে রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না, তাই—

হঠাৎ আলমারীর মাথায় নজর আটকে যায় প্রথম অফিসারের। বলেন, বাড়িতে ঘুমের ওষুধ কে খায় ?

একটু অবাক হয় পিকলু।—ঘুমের ওষুধ !

—ঐ যে, আলমারীর মাথায় দেখছি।

পিকলুর মনে পড়ে যায় জয়ন্তকাকুর হারানো ঘুমের ওষুধটার কথা। কিন্তু কি ভেবে যেন সেটা চেপে গিয়ে বলে, আমার মা খান। রাত্রে

ভাল ঘুম হয় না কিনা, তাই ডাক্তার খেতে বলেছেন।

আরো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে বিদায় নিলেন অফিসাররা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন পিকলু। আর বেশীক্ষণ জেরা করলে হয়তো নিজেকে সামলাতে পারত না। ঠিক ধরা পড়ে যেত।

ওঁরা বেরিয়ে যেতেই দরজাটা সন্তর্পণে বন্ধ করে দেয় পিকলু। দরজায় পিঠ দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। গলাটা শুকিয়ে আসছে ওর। শরীরটা কাঁপছে।

কিছুক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে, সোজা ছোট ঘরটায় চলে আসে। হাত জোড় করে কাঁপা গলায় বলে, প্লীজ, এবার আপনি চলে যান। পিউ ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

যুবকটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যাব না তো কি থাকার জন্য এসেছি? পুলিশ এ পাড়া ছেড়ে চলে গেলেই কেটে পড়ব।

পিউ এতক্ষণ ভয়ে কুঁকড়ে ঘরের এক কোণে বসেছিল। চোখে কেমন ঘোলাটে দৃষ্টি। ঠোঁট দুটো সাদা।

ওর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে যুবকটি বলল, ঘরে কিছু খাবার আছে? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

পিকলু একটু ভেবে বলল, রুটী, জেলি, মাখন আছে।

রুক্ষস্বরে বলল যুবকটি, কিছু রুটী আর জেলি নিয়ে এসতো। চা তো করতে পার না?

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায় পিকলুর। মাথায় একটা মতলব ঝিলিক মেরে যায়। তবু সামলে নিয়ে বলে দুধ খাবেন? আমি এক্ষুণি হিটারে গরম করে দিতে পারি।

যুবকটি চাপা বিদ্রূপের সুরে বলে, খুব অতিথিবৎসল ছেলে দেখছি! ঠিক আছে, আন।

একটু বাদেই পিকলু রুটী, জেলি আর এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসে।

দেখে খুব খুশী হয় যুবকটি। বলে, রেখে যাও। এতক্ষণে পুলিশ চলে গিয়েছে মনে হয়। আমি আর কিছুক্ষণ থেকেই চলে যাব।

নিজের ঘরে গিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বসে থাকে পিকলু। মনে মনে দারুণ উত্তেজনা বোধ করছে।

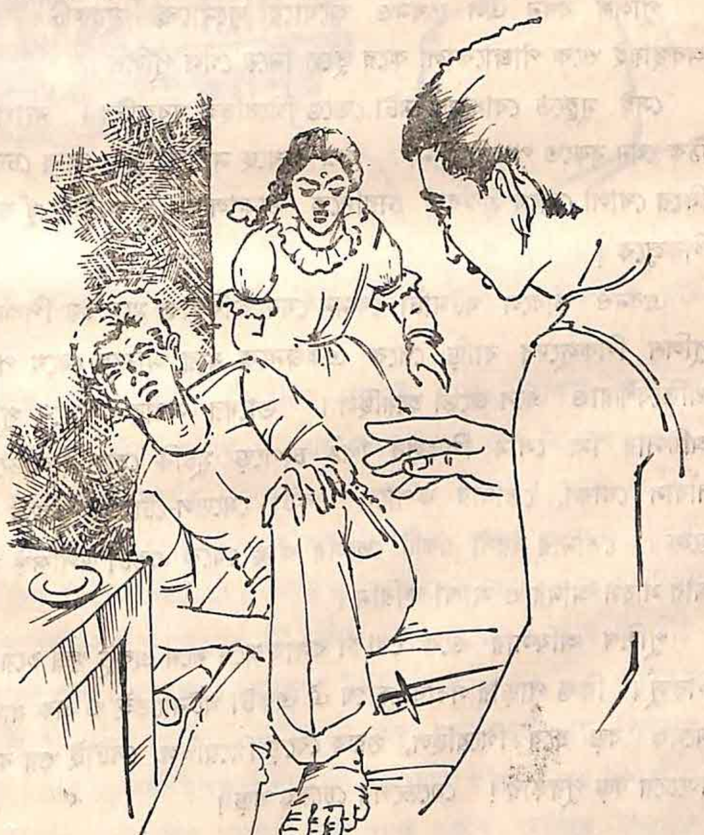
একটু বাদেই হঠাৎ ছোট ঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে পিউ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, দাদা লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

আনন্দে, উত্তেজনায় চোখ ছুটো ঝিলিক মেরে ওঠে পিকলুর—কি বললি ? ঘুমোচ্ছে ? চলতো দেখি।

পিকলু গিয়ে দেখে, সত্যিই বিছানার ওপর ক্লান্তভাবে ঘুমিয়ে আছে যুবকটি।

টেবিলের ওপর ছুধের গ্লাস আর খাবার প্লেটটা খালি।

উত্তেজনায় বোনের হাত চেপে ধরে পিকলু। চাপা উত্তেজনায়



ফিসফিস করে বলে, শীগগির চলে আয়।

ছুটতে ছুটতে বোনকে নিয়ে নিচে নেমে আসে পিকলু।

পুলিশ তখন পাড়া সার্চ করে জীপে গিয়ে উঠছিল। পিকলু চীৎকার করতে করতে ছুটে যায় জীপটার দিকে।

—শীগগির আসুন, শীগগির আসুন আমার সঙ্গে, আপনারা যাকে খুঁজছেন সে আমাদের বাড়িতে আছে। ঘুমোচ্ছে।

অফিসার অবাক হন! ঘুমোচ্ছে মানে? এই মাত্র তো তোমাদের বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম আমরা।

পিকলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, সে অনেক কথা। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। লোকটা মানুষ খুন করে এসেছে।

পুলিশ যখন এল তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে যুবকটি। ঘুমন্ত অবস্থায়ই ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ।

সেই মুহূর্তে বোধহয় ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল যুবকটির। ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝতে পারছিল না। স্বপ্ন দেখছে না তো? এবার চেতনায় ফিরে খোলা চোখে একবার চারদিকে তাকাল ও। কাকে খুঁজছে? পিকলুকে?

এখনও ভাবলে ঘটনাটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয় পিকলুর। পুলিশ পিকলুদের বাড়ি থেকে একজনকে ধরে আনছে দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরাও এসে জড়ো হয়েছিল। তাদের সবার সামনে পুলিশ অফিসার মিঃ সোম পিকলুর পিঠ চাপড়ে মুচকি হেসে বলেছিলেন, সাবাস খোকা, তোমার কপালে একটা মেডেল-টেডেল ঝুলছে মনে হচ্ছে। তোমার বয়সী একটি ছেলের কাছ থেকে এতটা উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহস আমরাও আশা করিনি।

পুলিশ অফিসার ওকে খোকা বলায় মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল পিকলু। কিন্তু পাড়ার সবার চোখে ঐ একটা ঘটনাতেই ও এক ধাক্কায় অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল, গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল, সেটাই ওর কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার! মেডেলের চেয়েও বড়!

খুনীর খপ্পরে পিকলু



পাপাই বরাবরই পিকলুর বন্ধু ছিল, এখন রীতিমত অন্ধ-ভক্ত হয়ে উঠেছে।

হবে নাই বা কেন ? এতদিন পাপাই ভাবত, পিকলু গোয়েন্দা কাহিনীর এক জীবন্ত গুদাম। সময় পেলেই তাই দেশ বিদেশের রাশি-রাশি রুদ্ধশ্বাস রোমহর্ষক গোয়েন্দা গল্প শুনত পিকলুর কাছ থেকে। অবশ্য সুযোগ পেলে যে পিকলুও ওরকম বুদ্ধির খেলা দেখাতে পারে, সেটা ঠিক বিশ্বাস করত না। কিন্তু গত ছ'মাসের ভেতর পিকলু সত্যিই পর পর পারিবারিক ক্ষেত্রের দুটি জটিল রহস্য উন্মোচন করে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ক্ষুদে গোয়েন্দা উপাধি অর্জনের পর, সে অবিশ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ও এখন শুধু অন্ধ-ভক্তই নয় পিকলুর, ভবিষ্যতে ওর একজন উপযুক্ত সহকারী গোয়েন্দা হবার স্বপ্নও দেখছে।

রোজের মত আজও সন্ধ্যার মুখে পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল

পিকলু ও পাপাই। গল্প করতে করতে একটা চৌরাস্তার মুখে আসতেই হঠাৎ দু'জনেই চমকে ওঠে বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে শুরু হল হৈ চৈ, ছুটোছুটি। ধোঁয়ায় চারদিক ছেয়ে গেছে। তারই ভেতর দুটি যুবককে, ওদের প্রায় সামনে দিয়েই, একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ছুটে যেতে দেখল ওরা। একটা ছেলের হাত থেকে একটা ভোজালীও পড়ে যেতে দেখল। ভোজালীটায় রক্তের দাগ।

যুবকদুটি ছুটে গিয়ে একটা জীপে উঠল। ঝড়ের বেগে চোখের সামনে দিয়ে মিলিয়ে গেল জীপটা। মুহূর্তে বুঝতে পারে পিকলু ঘটনাটা কী। কী ভেবে যেন লোকজনের ছুটোছুটির ভেতর থেকেও ভোজালীটা পা দিয়ে সরিয়ে আনল পিকলু। সেটা তুলে রুমালে আলতোভাবে জড়িয়ে পকেটে রাখল। তারপর পাপাইয়ের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, কুইক্! ছিনতাই কেস্। এখনও ফলো করলে হয়তো ধরা যাবে।

পাপাইয়ের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আমতা আমতা করে বলল, ওরা তো বেরিয়ে গেল। আমরা কি করে—

পিকলু বলল, আয় তো।

পাপাইকে নিয়ে ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ির কাছে ছুটে আসে পিকলু। ভেতরে গম্ভীর মুখে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন স্টিয়ারিং ধরে। বয়স বছর চল্লিশ হবে। আকস্মিক ঘটনায় উনিও হয়তো হতভম্ব।

পিকলু হাঁপাতে হাঁপাতে ভদ্রলোককে বলল, ক্রিমিনাল দু'জন একটা জীপে উঠে চলে গেল। কোনদিকে গিয়েছে দেখেছি আমরা। এখনও হয়তো ফলো করলে ধরা যাবে ওদের। আমাদের তুলে নিয়ে শিগগির চলুন।

ভদ্রলোক সামান্য বিরক্তির সুরে বললেন, পাগলা, না মাথা খারাপ! ও-সব গোলমালে কেউ সেধে নাক গলায়? যাও যাও, বাড়ী চলে যাও।

পিকলু উত্তেজিতভাবে জবাব দিল, আপনি কী বলছেন দাদা?

চোখের সামনে দিয়ে ছিনতাই করে ছুটো ক্রিমিনাল পালিয়ে গেল, আর ভয়ে আপনি চুপচাপ গাড়ির ভেতর বসে থাকবেন? বলতে আপনার লজ্জা করছে না?

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, বয়স অল্প তো, তাই এসব নাটুকে ব্যাপারে খুব মজা পাচ্ছ। বয়স হলে বুঝবে, কেন এসব ব্যাপারে সখ করে জড়িয়ে পড়তে নেই। তাছাড়া ওদের এখন পাচ্ছ কোথায়? কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। আর দেখলেও কি চিনতে পারবে?

পিকলু জোর দিয়ে বলল, আলবৎ পারব। ছ'জনকেই বেশ ভাল করে চিনে রেখেছি আমি। পরে কোথাও দেখলেও ঠিক চিনতে পারব।

পাপাই বিরক্ত হয়ে বলল, বুঝতেই তো পারছিস পিকলু কি ধরনের কাওয়ার্ড উনি। ওঁকে রিকোয়েস্ট করে মিথ্যে সময় নষ্ট না করে এক্ষুনি একবার থানায় চল। অন্তত ভোজালীটা তো পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। ওরা যদি আঙ্গুলের ছাপ-টাপ দেখে—

এরকম বাচ্চা একটা ছেলের মুখে কাওয়ার্ড শব্দটা শুনে, সঙ্কোচেই কিনা কে জানে, গাড়ির দরজাটা খুলতে খুলতে বললেন ভদ্রলোক, জানি বৃথা চেষ্টা, তবু বলছ যখন, চল ; একবার চেষ্টা করে দেখি।

পিকলু আর পাপাইকে তুলে নিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

ঠিকই বলেছিলেন উনি। এলোমেলোভাবে অনেকদূর পর্যন্ত অনেক রাস্তা ঘুরেও জীপটার কোন হদিশ পাওয়া গেল না।

তার ভেতর হঠাৎই আবার হয়ে গেল লোড্‌শেডিং। মুহূর্তে গোটা অঞ্চলটা অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

ভদ্রলোক বললেন, দেখলে তো খোকা, ঠিক বলেছিলাম কিনা। ক্রিমিনালরা একবার বেরিয়ে গেলে আর কি পাত্তা পাওয়া যায়?

পিকলু গম্ভীর মুখে বলল, তবু একবার চেষ্টা করে দেখলাম। অবশ্য আপনিও কিছুটা দেরী করিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা বলামাত্র যদি আপনি গাড়ি স্টার্ট দিতেন—

ভদ্রলোক হেসে বললেন, তাতেও কোন লাভ হত না। ওরা কোন্ গলি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছে তাতো আর বুঝতাম না আমরা।

কথা বলতে বলতে গাড়িটা এ-রাস্তা ও-রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল। পিকলু ঠিক বুঝতে পারছিল না গাড়িটা কোন্ দিকে যাচ্ছে।

একসময় বলল, আমাদের মৌলালীর কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দিলেই চলবে, আমরা বাসে বা ট্রামে চলে যাব।

ভদ্রলোক হঠাৎই জিজ্ঞেস করলেন, ছিনতাইকারী দু'জনকে দেখলে সত্যিই চিনতে পারবে তোমরা ?

পাপাই বন্ধুগর্বে গর্বিত হয়ে বলল, আমি না পারলেও ও পারবে। ওর দারুণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর স্মরণশক্তি। ও নিজেও একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা।

ভদ্রলোক শুনে যেন মজা পেলেন। বললেন, আচ্ছা!

গাড়িটা বেলেঘাটার ভেতর দিয়ে আসছিল। একটা গলির ভেতর ঢুকে থামল গাড়িটা। সামনে একটা তেতলা পুরোন বাড়ি।

পিকলু জিজ্ঞেস করল, এখানে থামলেন কেন ?

ভদ্রলোক গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে গাড়ি থেকে নেমে বললেন, এস, আমার সঙ্গে এস তোমরা।

পিকলু বলল, কোথায় ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, কি, বীরপুরুষরা ভয় পেয়ে গেলে ? কোন ভয় নেই, নেমে এস। এটা আই বি অফিস। এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন,—অফিসার। নিজেরা চেষ্টা করেও তো জীপটার কোন পাত্তা পেলাম না, ওকে একবার ঘটনাটা জানিয়ে যাই। তোমাদের কাছ থেকে অন্তত ছেলেদুটোর ডেসক্রিপশনটা তো জানতে পারবে। এখনও ভেবে দেখ, ওদের চেহারা সত্যিই মনে আছে তো তোমাদের ?

পিকলু ছোট্ট করে জবাব দিল, আছে।

আসলে পিকলু একটু অন্যমনস্ক ছিল। ঠিক বুঝছিল না, এরকম একটা অপরিচিত জায়গায় ঢোকাটা উচিত হবে কিনা। আবার আপত্তি জানাতেও লজ্জা পাচ্ছিল। ভদ্রলোক তাতে হয়তো ওদের ভীতু মনে করবেন। আবার ভাবল, গাড়ি আছে যখন, সম্ভ্রান্ত কোন নাগরিকই

তো হবেন, কোন চোর বাটপাড় নন, তাহলে আর ভয়ের কি আছে। ভদ্রলোক আর একবার ডাকতেই পাপাইকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল পিকলু। ওঁর সঙ্গে ভেতরে এগিয়ে গেল।

ওদের নিয়ে সোজা তেতলায় উঠে গেলেন ভদ্রলোক। একটা ঘরের সামনে এসে বললেন, এস, ভেতরে এস।

ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে এক ফালি আলো এসে বাইরে পড়ছিল।

আবারও একটু ইতস্তত বোধ করে পিকলু ভিতরে যেতে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, কি হল, এস ? ভয় লাগলে বল, নিচে নিয়ে যাচ্ছি।

এরপর আর পিছিয়ে আসার প্রশ্ন আসে না। পিকলু পাপাইকে নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভিতরে ঢুকল।

কিন্তু ভেতরে পা দিয়েই সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে পিকলু। একটা চৌকির ওপর তিন চারটি ছেলে বসে আছে। সামনে মদের গ্লাস, বোতল। তার ভেতর সেই ছিনতাইকারী ছেলে দুটিও আছে। এমন কি ছিনতাই করা সেই ব্যাগটাও নজরে পড়ল।

ওদেরই একজন বলল, কি ব্যাপার, বাগচীদা ? নতুন করে ছেলে-ধরা ব্যবসা শুরু করলে নাকি ? এ দুটিকে সংগ্রহ করে আনলে কোত্থেকে ? না কি নতুন রিক্রুট।

ভদ্রলোক, অর্থাৎ বাগচীদা হেসে বললেন, তোমাদের সঙ্গে মোলাকাৎ করানোর জন্য নিয়ে এলাম।

ছেলেটি বলল, মানে ?

বাগচীদা বললেন, তোমাদের পাহারাদার হিসাবে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, তোমরা সেফ্‌লি কাজ সেরে জীপ নিয়ে বেরিয়ে যেতেই এই বালকদুটি আমার কাছে ছুটে এসে বলল, ওরা অপরাধীদের দেখেছে, ভাল করে চিনেও রেখেছে ; আমি যেন ওদের গাড়িতে তুলে নিয়ে তক্ষুণি তোমাদের জীপটাকে ফলো করি। অগত্যা তাই করতে হল। রাস্তায় তোমাদের পাত্তা না পেয়ে তাই এখানেই নিয়ে এলাম



ওদের তোমাদের সনাক্ত করানোর জন্য।

তারপর পিকলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ক্ষুদে গোয়েন্দা, এরাই তো ?

পিকলু, পাপাই দুজনেই বুঝতে পারে এবার, কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে ওদের। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকেই মনে মনে ধিক্কার দিতে থাকে পিকলু।

বাগচীদা ঠাট্টার সুরে বললেন, কি হল, চিনতে পারছ না ?

অপরাধীদের দ্বিতীয়জন চাপা বিরক্তির সুরে বলল, কাজটা তুমি ঠিক করনি, বাগচীদা। ব্যাপারটাকে যে এমন লাইট্‌লি নিলে কেন, বুঝছি না।

বাগচীদা এবার একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, লাইটলি নিইনি বলেই ওদের ওখানে আনা ছাড়া উপায় ছিল না। ওরা শুধু তোমাদেরই চিনে রাখেনি, রাস্তা থেকে তোমাদের রক্তমাখা ভোজালীটাও তুলে এনেছে। ভোজালীটা থানায় জমা দিতে যাচ্ছিল ওরা।

ঘরের সবাই এবার সচকিত হয়।

পিকলু ওদের অজ্ঞাতে পাপাইকে ছোট্ট একটা ইশারা করে ঘর থেকে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বিদ্যুদ্বেগে দরজার মুখে সরে গেলেন বাগচীদা। দরজাটা আগলে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে অন্যরাও ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওদের।

একটি ছেলে তুড়ি মেরে পিকলুকে বলল, ভাল ছেলের মত ভোজালীটা বের করে দাও তো, চাঁদু।

প্রতিবাদ জানানো বৃথা, তাই নিঃশব্দে পকেট থেকে ভোজালীটা বের করে ছেলেটির হাতে তুলে দিল পিকলু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছেলে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, বক্কা, একটা খারাপ খবর আছে ; টার্গেটের অবস্থা ভাল নয় শুনলাম। টেঁসেও—

বাগচীদার ইশারায় থেমে যায় ছেলেটি। এতক্ষণে পিকলুদের দিকে নজর পড়ে। ইশারায় জানতে চায়, কি ব্যাপার!

বাগচীদা নতুন ছেলেটিকে বললেন, ওরা আপাততঃ এখানেই থাক। তুই নজর রাখ ওদের ওপর। আমরা পাশের ঘর থেকে আসছি।

সবাইকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন বাগচীদা। যাবার আগে পিকলুদের বলে গেলেন, কোন রকম চীৎকার চেঁচামেচি করবে না। তাহলে লাশ পড়ে যাবে।

পাহারাদার ছেলেটি এর ভেতরই পোষাকের ভেতর থেকে একটা রিভলবার টেনে বের করে নিয়েছে।

আন্দাজেই বুঝতে পারে পিকলু, পরামর্শের জন্য সবাইকে নিয়ে অন্য ঘরে গেলেন বাগচীদা এবং আলোচনাটা নিশ্চয়ই ওদের প্রসঙ্গেই।

মনে মনে বেশ কিছুটা ঘাবড়ে যায় পিকলু। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে, আতঙ্কে পাপাইয়ের মুখও সাদা হয়ে গেছে। পা কাঁপছে ওর।

ভয় জিনিসটা সংক্রামক। পিকলুরও এবার বুকটা শুকিয়ে আসে আতংকে। ওদের নিয়ে এরা কি করবে অনুমান করতে পারে না। একবার মনে হয়, প্রাণের ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে ছেড়ে দেবে হয়তো।

আবার মনে হয়, সে ঝুঁকি নেবে কেন ওরা ? নিশ্চয়ই খুন করে লাশ গায়েব করে দেবে।

পেছনে দরজা খোলার শব্দ হল। পিকলু ঘাড় ফেরানোর আগেই কে যেন আচমকা পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। একটা রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরল ওর। কেমন ঝাঁঝালো একটা গন্ধ রুমালে। লোকটার হাত ছাড়ানোর সামান্য চেষ্টা করে পিকলু। কিন্তু বৃথা। শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। গভীর একটা ঘুম ক্রমেই আচ্ছন্ন করে আনছে ওকে। চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা··· আরো ঝাপসা···আরো··· !

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন ছোট্ট একটা ঘরে শুয়ে আছে পিকলু। পাশে পাপাই। তখনও ঘুমাচ্ছে।

ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। কোন সৌখিন লোকের ঘর মনে হয়। আসবাবপত্র অবশ্য বেশি নেই। একটা টেবিল, কটা চেয়ার। টেবিলের ওপর অ্যাস্ট্রে। সিগারেটের টুকরো ভর্তি। ঘরের ভেতর সিগারেটের একটা হাল্কা গন্ধ। কিছুক্ষণ আগে এখানে বসে কেউ সিগারেট খেয়েছিল নিশ্চয়ই।

ঘরটার চেহারা দেখে মনে হয়, খুব বেশি দিনের পুরোণো নয় বাড়িটা ; বলতে গেলে নতুনই।

দেওয়ালে ছোট্ট একটা ক্যালেণ্ডার। একটা মেয়ের ছবি তাতে। কিন্তু ক্যালেণ্ডারটা গত বছরের। তাহলে কি ঘরটা কেউ বসবাসের জন্য ব্যবহার করে না ? মাঝেমধ্যে এসে বসার জন্য শুধু ? কে জানে !

হঠাৎ একটা প্রাইভেট কারের হাল্কা হর্ণের শব্দ শুনতে পায় পিকলু। আবারো।

শব্দের দূরত্ব থেকে মনে হল এবার, অন্ততঃ সাত-আট তলার ওপরের ঘর এটা। তাহলে কি ঘরটা ফ্ল্যাট বাড়ির অংশ ? ঠিক বুঝতে পারে না।

মুখে একটা চাপা শব্দ করে পাশ ফিরে শোয় পাপাই। পিকলু

এবার ধাক্কা দিয়ে ডাকে ওকে, পাপাই ? এই পাপাই ? ওঠ।

পাপাই চোখ মেলে তাকায়। এখনও কেমন ঘুমের ঘোর চোখে। ঠিক যেন বুঝতে পারছে না, ও কোথায়।

আস্তে উঠে বসে। জিজ্ঞেস করে, এটা কার ঘর ? কাদের বাড়ি ?

পিকলু বলল, জানি না। ওরা আমাদের অজ্ঞান করে এখানে এনে তুলেছে। এটা কলকাতা কিনা তাও জানি না।

এবার সব মনে পড়ে পাপাইয়ের। কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, ঠোঁটের ওপর আঙ্গুল রেখে ইশারায় ওকে থামতে বলে পিকলু। কান পেতে একটা শব্দ শোনার চেষ্টা করে। শব্দটা পাপাইয়েরও কানে এসেছে। মিষ্টি একটা টুং-টুং শব্দ।

—ট্রামের শব্দ না ?

মাথা নাড়ে পিকলু, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস। তাহলে কলকাতাতেই আছি আমরা।

এবার দু'জনে পরামর্শ করতে বসে, এখান থেকে বাইরে একটা খবর পাঠানো যায় কি করে ? ঘরে কোন জানালা নেই। একটা মাত্র দরজা, সেটাও বাইরে থেকে বন্ধ নিশ্চয়ই। ঘরটা ভাল করে দেখে এবার মনে হয় পিকলুর, একটা বড় ঘরে পার্টিশন দেওয়াল তুলে এই আলাদা ঘরটা তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। নাহলে, আকারে যত ছোটই হোক, ঘরে কোন জানালা থাকতই।

আন্দাজেই বুঝল ওরা, এ-ঘরে বসে চীৎকার করেও কোন লাভ নেই। নিশ্চয়ই গুণ্ডারা এমন কোন ঘরে রাখে নি ওদের, যেখান থেকে চীৎকার করে লোক ডাকা যায়। তাহলে ?

পাশের ঘরে দরজা খোলার শব্দ হল। কয়েকজনের কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল। এগিয়ে গিয়ে দরজার ওপর কান পেতে দাঁড়াল ওরা।

তিনচারজনের আলোচনা শুরু হল ওঘরে। একটা স্বর চিনতে পারে ওরা। বাগচীদার স্বর।

একটু পরেই বুঝতে পারে, আলোচনাটা সেদিনের ঘটনা নিয়েই। বক্কাদের খুনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না, নেহাৎ লোকটা বড় রকমের

বাধা দেওয়াতেই নাকি ভোজালীটা চালিয়েছিল মনা। কিন্তু বেকায়দায় লেগে যাওয়ায় সেই টার্গেট লোকটি হাসপাতালে মারা গেছে। একই সঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে লোপাট হয়ে গেছে পিকলুরা। পুলিশ বুঝছে না, ঘটনাটা কাকতলীয়, না, ঘটনাদুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে। পুলিস তাই মরীয়া হয়ে মাঠে নেমেছে অপরাধীদের ধরার জন্য।

বক্কাই বোধহয়, সামান্য অনুযোগের সুরে বলল, ছেলেদুটোকে ধরে এনে খুব ভুল করেছিলে, বাগচীদা। পুলিশ না হয় পেতই ভোজালীটা ; শুধু ওটা থেকে আমাদের ট্রেস করতে পারত না। এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঐ ছেলে দুটো। কতদিন আটকে রাখবে ওদের ?

কে একজন যেন বলল, খতম করে দিলেই হয়। লাশ গুম করে দিলে কেউ জানতেও পারবে না ওদের কারা ধরেছিল।

বাগচীদা বললেন, না-না, কেস্ তাতে আরো কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। আরো জট পাকিয়ে যাবে। ওদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিলে ভয়েই আর ওরা মুখ খুলবে না মনে হয়।

বক্কা বলল, তারপর ওদের আবার অজ্ঞান করে কোথাও ফেলে রেখে এলে ওরা বলতেই পারবে না, কোথায় আটকে রাখা হয়েছিল ওদের। কারা আটকে রেখেছিল।

বাগচীদা বললেন, সে যাহোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে'খন। কিন্তু আমার মনে হয়, বক্কা আর মনার কিছুদিনের জন্য এখান থেকে গা ঢাকা দেওয়া উচিত।

বক্কা বলল, পুলিসের নজর এড়িয়ে এখনই সেটা সম্ভব হবে কিনা বুঝছি না। আর ক'টা দিন যাক !

কে যেন বলল, ছেলেদুটোর কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না তো ? ওদের কি এখনও জ্ঞান ফেরেনি ?

বাগচীদা বললেন, দেখছি। তোমরা এ-ঘরেই থাক। রামলালের সঙ্গেও ওদের একবার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ওদের দেখাশুনো, খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভারটা তো ওকেই নিতে হবে।

পিকলুরা বুঝতে পারে, এবার বাগচীদার এঘরে আগমন ঘটবে।

পিকলুর পরামর্শে ওরা দুজন ঘরের মেঝেতে এসে বসে। হাঁটুর খাঁজে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করে। অর্থাৎ দলটাকে বোঝানো, ওরা অতি ছেলেমানুষ। ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে ওরা।

দরজা খুলে বাগচীদা ঘরে ঢোকেন। সঙ্গে আর একজন লোক। বয়স পঞ্চাশ মত হবে। বয়স হলে কি হবে, এখনও লোকটার চোখের দিকে তাকালে ভয় লাগে। আন্দাজেই বুঝতে পারে ওরা, এরই নাম রামলাল।

ওদের সামনে এসে স্নেহের সুরে ডাকেন বাগচীদা, পিকলু।

ওরা মাথা তুলে তাকায়। পিকলু ভয়ের ভাণ করে বলে, আপনার পায়ে পড়ি বাগচীদা, আমাদের প্রাণে মারবেন না।

বাগচীদা অভয় দিয়ে বলেন, পাগল ছেলে! তোমাদের মারব কেন? কেমন যেন তালে গোলে তোমরা জড়িয়ে পড়লে ঘটনাটার সঙ্গে। তোমরা যদি আমাদের কথামত চল, তাহলে কোন ভয় নেই তোমাদের।

পিকলু বলল, আপনাদের সব কথা শুনব আমরা। বলুন, আমাদের কি করতে হবে।

বাগচীদা বললেন, আপাততঃ কয়েকটা দিন এখানেই শান্ত হয়ে থাকতে হবে তোমাদের। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন গোলমাল করবে না, চেঁচামেচি করবে না। এখান থেকে পালাবার বৃথা চেষ্টা করবে না। কথার অবাধ্য হলে কিন্তু তোমাদের প্রাণের কোন দায়িত্ব আমি নিতে পারব না, সে কথা আগেই জানিয়ে রাখছি তোমাদের।

পাপাই মিন মিন করে বলল, আমরা কথা দিচ্ছি, আমরা কোন গোলমাল করব না।

বাগচীদা বললেন, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। এই লোকটিকে চিনে রাখ তাহলে। এই-ই তোমাদের দেখাশুনা করবে। যখন যা প্রয়োজন একে বলবে। ওকে ডাকার দরকার হলে দরজায় টোকা দিও, তাহলেই ও এসে দরজা খুলে দেবে।

পিকলু, পাপাই দুজনেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ওরা এত সহজে বশ্যতা স্বীকার করায় বাগচীদাও খুশি হন। রামলালকে ওদের চা জলখাবার দেবার নির্দেশ দিয়ে পাশের ঘরে চলে যান আবার।

দু'দিন পেরিয়ে গেল।

বাধ্য হয়েই রামলালের বশ্যতা স্বীকার করে শান্ত ছেলের মতই সময় কাটায় পিকলু ও পাপাই। সকালে ওর পাহারায় বাথরুমে যায় আসে। দু'বেলা ওর দেওয়া যে কোন খাবার নিঃশব্দে গিলে যায়। রামলালের কাছ থেকে কিছুই জানতে চায় না। রামলালও কোন প্রশ্ন করে না ওদের।

রামলাল ছাড়া বাড়িটায় আর কেউ বাস করে না মনে হয়। অন্তত এই তলায়। মাঝেমাঝে রাত্রে, অনেক রাত পর্যন্ত, পাশের ঘরে চাপা কথাবার্তা শোনা যায়। মদের বোতলের শব্দ কানে আসে। কিন্তু যারা আসে তারাও আবার চলে যায়। রাত্রিবাস করে না।

যতক্ষণ জেগে থাকে, পিকলু আর পাপাই শুধু ওদের বর্তমান অবস্থার কথাই আলোচনা করে। কিন্তু এখান থেকে পালানোর বা বাইরে কোন সংবাদ পাঠানোর কোন উপায়ই খুঁজে বের করতে পারে না। নিজেদের অসহায় মনে হয়। তাহলে কি নিজেদের ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই?

রাতদিন চুপচাপ বসে ভাবে পিকলু। ওর পড়া বইগুলো মনে করার চেষ্টা করে। কিন্তু এভাবে বন্দী কোন ডিটেকটিভ এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়েছিল, এমন কোন ঘটনার কথা মনে পড়ে না। দেশী-বিদেশী সব গোয়েন্দা গল্পের গোয়েন্দাই একাধিকবার শত্রুর হাতে বন্দী হয়, আবার উদ্ধারও পায়। কিন্তু তাদের পরিবেশ বা পালানোর পদ্ধতির সঙ্গে ওদের বর্তমান অবস্থার কোন মিল নেই।

থেকে থেকেই মা বাবার কথাও মনে পড়ে। বিশেষ করে মা-র কথা। নিশ্চয়ই মা নাওয়া-খাওয়া সব ত্যাগ করেছে। সারারাত জেগে থাকছে। এতদিনে পাগল হয়ে গেছে কিনা তাই বা কে জানে?

পাপাই মামাবাড়িতে থেকে পড়ে। দাদু দিদার কথা ভেবে ওরও ভীষণ মন খারাপ। এতদিনে মা-বাবাও নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গ্রামের বাড়ি থেকে কলকাতা চলে এসেছে। তাদের কথা ভেবেও ভীষণ দুঃখ হয় পাপাইয়ের। অনেক সময় গোপনে বসে কাঁদে।

একদিন পাপাইকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে পিকলু ওর পাশে গিয়ে বসে।

—কিরে, মন খারাপ লাগছে ?

পাপাই বলে, আমাদের দু'জনেরই বাড়ির অবস্থা এখন কেমন, ভাবতে পারছি নারে পিকলু।

পিকলু গম্ভীর গলায় বলল, একবার পালানোর চেষ্টা করে দেখবি ?

শুনে অবাক হয় পাপাই। বলে, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। খালি হাতে ঐ বুড়ো ডাকাতটাকে কাবু করবি কি করে ? ঐ রামলাল লোকটা নির্ঘাৎ একসময় জল্লাদ ছিল। এখনও আমাদের মত দশটা ছেলেকে একা মোকাবিলা করতে পারে ও।

পিকলু বলল, সব সময় কি গায়ের জোরেই সব কিছু হয় ? বুদ্ধিতেও কাজ সারা যায়।

পাপাই বুঝতে পারে, কোন একটা মতলব মাথায় এসেছে পিকলুর। সেটাই একবার ও বাজিয়ে দেখতে চাইছে।

পিকলুর দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে তাই, কিছু ভেবেছিস মনে হচ্ছে ?

পিকলু বলল, ভাবছিলাম। কিন্তু এখন নয়, রাত্রে বলব।

পরদিন সকালে রামলাল ওদের খাবার দিতে এলে পিকলু আবদারের সুরে বলল, রামলালদা, রোজ এই খাবার ভাল লাগে না। একদিন একটু মুখ বদলানোর ব্যবস্থা কর না।

রামলাল গম্ভীর গলায় বলল, কেন, কেক্ প্যাটিসে মন ভরছে না নবাব পুত্তুরদের ?

পিকলু একটু হেসে বলল, বাদশার খানাও রোজ খেলে একঘেয়ে

হয়ে যায়। এবার একটু গরীব খানা খেতে ইচ্ছে করছে।

রামলাল ভুরু কুঁচকে বলে, কি খেতে চাও, বল ?

পিকলু বলল, অনেকদিন ছাতু খাই না, একদিন একটু ছাতু খাওয়াও না।

রামলাল বলল, এত খাবার থাকতে হঠাৎ ছাতু কেন ?

পিকলু বলল, বাড়িতে থাকতে রোজ ব্যায়াম করার পর ছাতু খেতাম তো, তাই।

রামলাল বলল, ঠিক আছে, দেখছি।

পরদিনই ওদের জন্য এক ঠোঙ্গা ছাতু এনে দিল রামলাল। সঙ্গে কয়েকটা পেঁয়াজ আর লঙ্কা। ছাতু দেখে যেন দারুন খুশি হল পিকলু, পাপাই।

সেদিন রাত্রেই শোবার আগে পিকলুরা একটা কাগজের ওপর কিছু ছাতু ঢালল। তারপর লঙ্কার বিচিগুলো টিপে টিপে বের করে সেই ছাতুর সঙ্গে বেশ ভাল করে মিশিয়ে রাখল।

পরদিন সকালে রামলাল ঘরে ঢুকে দেখে, পিকলু তখনও বিছানায় শুয়ে। একটা চাপা অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করছে।

রামলাল ওর কাছে এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে ?

পিকলু থেমে থেমে বলল, বড্ড মাথা ধরেছে। জ্বর হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না।

রামলাল একটু নিচু হয়ে ওর কপালে হাত রাখল। আর সঙ্গে সঙ্গে পিকলু ওর হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখা লঙ্কার বিচি মেশানো ছাতুগুলো ছুড়ে দিল রামলালের চোখে।

রামলাল দু'হাতে চোখ চেপে ধরে।

সেই সুযোগে পিকলু আর পাপাই এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির মুখের কোলাপসেবল গেটের তালাটা খোলাই ছিল। এক টানে গেটটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে যায় ওরা।

কিন্তু সিঁড়ির বাঁকে এসে থমকে দাঁড়ায়। এখানে যে আর একটা

কোলাপসেবল গেট আছে সেটা জানত না ওরা। গেটের গায়ে মোটা একটা তালা ঝুলছে।

মুহূর্তের জন্য কেমন ঘাবড়ে যায় ওরা। ঠিক বুঝতে পারে না, এখন কি করণীয়।

পিকলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, শিগগির আবার ওপরে চল পাপাই। দেখি বাথরুমের জানলাটা ভেঙ্গে—

কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়ির মুখে পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকায় ওরা। দেখে, পাথরের মূর্তির মত সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রামলাল। চোখদুটো আগুনের মত জ্বলছে। হাতে একটা বড় ছোরা।

বাজখাই গলায় বলল রামলাল, উঠে এস।

বাধ্য ছেলের মত পায়ে পায়ে ওপরে উঠে এল পিকলু পাপাই।

ইশারায় ঘরের দিকটা দেখিয়ে দিল রামলাল। ওরা দু'জন নিঃশব্দে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রামলাল ঘরে ঢুকে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। সামান্যক্ষণ ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে আচমকা দুটো বিশাল চড় মারল ওদের গালে। দু'জনেই ছিটকে পড়ল ঘরের মেঝেতে। রামলাল নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে শেকল তুলে দিল দরজায়। দুপুরে কোন খাবারও দিয়ে গেল না ওদের।

সন্ধ্যার পর বাগচীদা ওদের ঘরে এসে ঢুকলেন অন্য মূর্তিতে। হাতে একটা হান্টার। রাগে থমথম করছে মুখ। সঙ্গে রামলাল।

ওদের সামনে এসে গম্ভীর গলায় বাগচীদা জিজ্ঞেস করলেন, পালানোর চেষ্টা করেছিলি?

নিঃশব্দে মাথা নিচু করে থাকে পিকলু, পাপাই।

বাগচীদা বললেন, এখন যদি তোদের খুন করে লাশদুটো গুম করে ফেলি? কেউ টের পাবে?

শুনে চমকে ওঠে পিকলু। আচমকা বাগচীদার পা জড়িয়ে ধরে বলে, আমরা অন্যায় করেছিলাম। মা-বাবার কথা ভেবে মন খারাপ হওয়ায়—

এক ঝটকায় পা ছাড়িয়ে নেন বাগচীদা। তারপর রামলালের দিকে তাকিয়ে বলেন, দু'দিন ওদের খাওয়া বন্ধ। দেখি তাতে তেজ মরে কিনা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যান বাগচীদারা। শব্দ শুনে বোঝে ওরা, দরজায় তালা পড়ল। তবু ঘটনাটা এত অল্পের ওপর দিয়ে মিটে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচে দুই বন্ধু। সত্যিই যদি ক্ষেপে গিয়ে আজ ওদের খুন করে ফেলত এই গুণ্ডার দল, বাধা দেবার কেউ ছিল না।

সত্যিই পরপর দু'দিন ওদের কপালে খাবার জুটল না। বড় একটা পাত্রে শুধু জল দিয়ে গেল একসময় রামলাল।

তবু বাঁচোয়া, রামলালের দেওয়া ছাতুর ঠোঙ্গাটা বেশ বড়ই ছিল! লুকিয়ে সেই ছাতু খেয়েই দুটো দিন কাটিয়ে দিল পিকলু পাপাই।

রাত্রে শুয়ে পাপাইকে বলল পিকলু, উত্তেজনার মুখে কাজটা একটু কাঁচাই করে ফেলেছিলাম, নারে পাপাই? এমন কড়া পাহারায় যারা রেখেছে, তারা যে সদর দরজা খুলে রাখবে না সে হিসেবটা করিনি আমরা।

পাপাই বলল, যা হবার হয়ে গেছে। এখন কি করা যায় ভাব।

পিকলু বলল, আর ক'টা দিন যাক, তারপর ভাবা যাবে। এখন কিছু ভাবতে পারছি না।

দিন দু'য়েক পর থেকেই আবার সব স্বাভাবিক হয়ে এল। আবার আগের মতই দু-বেলা খাবার আর জলখাবার পৌঁছে দিতে লাগল রামলাল। কিন্তু বুঝতে পারল ওরা, আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গেছে লোকটা।

পিকলুকে দেখেই বুঝতে পারে পাপাই, ও আবার ভাবতে শুরু করেছে। তাই আগে থেকেই সতর্ক করে দেবার জন্য বলল, আর কিন্তু পালানোর প্ল্যান-ফ্ল্যান করিস না পিকলু।

পিকলু বলল, না। ন্যাড়া দু'বার বেলতলায় যায় না। এবার অন্য একটা কথা ভাবছি।

—কি ?

পিকলু সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে বলল, আচ্ছা পাপাই, আমাদের ঘর থেকে রোজ বাথরুমে যাবার পথে কোনদিন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নজরে পড়েছে তোর ?

পাপাই স্মৃতি হাতড়ায়। বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে ? সামনেই সিঁড়ির মুখে একটা কোলাপ্সেবল গেট।···বারান্দায় একটা হাতমুখ ধোবার বেসিন। টবে একটা ফুলগাছ।···শূন্য একটা পাখির খাঁচা।··· পাশের ঘরের দরজার মুখে একটা ময়লা ফেলার টিন।···আর, আর— আর কিছুতো মনে পড়ছে না।

পিকলু বলল, এর ভেতর কোন একটা জিনিসকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না ? মানে, বাইরে সংবাদ পাঠানোর ব্যাপারে ?

অবাক হয় পাপাই। বলে, কি করে ? তুই কি স্বপ্ন দেখছিস ?

পিকলু কেমন অন্যমনস্কভাবে থেমে থেমে বলে, স্বপ্ন নয়। অবশ্য সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, বুঝলি ?

কিছুই মাথায় ঢোকে না পাপাইয়ের। বলে, একটু খুলে বলতো, কি ভাবছিস ?

একবার যাচাই করে নেবার জন্য পিকলু ওর পুরো পরিকল্পনাটা এবার খুলে বলে পাপাইকে।

—ঐ ময়লা ফেলার টিনটাকেই কাজে লাগান যায় কিনা ভাবছিলাম। বাথরুমে যাবার সময় লক্ষ্য করেছি, খাবারের প্যাকেট, ঠোঙ্গা, সিগারেটের প্যাকেটে প্রায়ই ভর্তি থাকে ওটা। বাগচীদারা চলে যাবার পর ঘর পরিষ্কার করে ওগুলো টিনে ফেলে রামলাল।

একটু থামে পিকলু। পাপাই বলে, ওটার ভেতর কোন চিঠি ফেলে রাখতে চাস ?

পিকলু বলল, না, চিঠি কারো নজরে পড়বে না। এমন একটা কিছু রাখতে হবে, যা নজরে পড়লে ময়লা নিয়ে যাওয়া ধাঙরটা লুব্ধ হতে পারে।

—কি হতে পারে সেটা ?

—তোর ঐ ঘড়িটা।

—মানে ?

পিকলু বলে, ধর, তোর ঐ ঘড়িটার ভেতর থেকে ঘড়ির যন্ত্রগুলো সরিয়ে নিয়ে সেখানে যদি ছোট্ট একটা চিঠি ভাঁজ করে ঢুকিয়ে রাখি। তারপর ঘড়িটা রামলালের নজর এড়িয়ে, কোন কাগজে আলতো ভাবে জড়িয়ে, ঐ ময়লা ফেলার টিনটার ভেতর ফেলে দিই ? ময়লা সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় সেটা নজরে পড়তে পারেনা ধাঙড়টার ?

পাপাই বলল, পড়লেই বা, তাতে আমাদের লাভ ?

পিকলু বলল, ওর পক্ষে একটা রিস্টওয়াচের লোভ সামলানো নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। কিন্তু বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখবে, ঘড়িটা চলছে না। তাই কোন ঘড়ির দোকানে নিয়ে যাবে ?

পাপাই চাপা উৎসাহে বলে, এবার কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। ঘড়ির দোকানে নিয়ে গেলে, দোকানের মালিক ঘড়িটা খুললেই ভেতরে একটা চিঠি দেখতে পাবেন। অবাক হয়ে চিঠিটা খুলে পড়বেন তিনি। আর পড়লেই সব কথা জানতে পারবেন। তাই তো ?

পিকলু বলল, একজাক্টলি। আর ভদ্রলোকের মাথায় বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকলে চিঠি পাওয়ার পর নিশ্চয়ই ধাঙড়টাকে ছাড়বেন না উনি। ওকে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দেবেন। আর ধাঙড়ের সূত্রেই পুলিশ এ জায়গার খোঁজ পেয়ে যাবে।

পাপাই আনন্দে জড়িয়ে ধরে পিকলুকে।—ইউনিক ! সত্যিই তোর একটা মাথা বটে !

পিকলু সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখে হাত চাপা দেয়। বলে, চুপ। তুই এমন গবেট কেন বলতো ?

পাপাই লজ্জা পেয়ে বলে, সরি।

সেদিন রাত্রেই ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছোট্ট একটা চিঠি লেখে পিকলু। —রাস্তা বা বাড়ির নম্বর জানি না। আমাদের চুরি করে এনে আটকে রাখা হয়েছে এখানে। উদ্ধার করুন। লোকটিকে আটকে রেখে থানায় খবর দিন। আমাদের বাড়ির ফোন নম্বরও দিলাম।’

পরিকল্পনামত এরপর পাপাইয়ের ঘড়ির পার্টস খুলে সেখানে চিঠিটা ভরে দেয় পিকলু।

পরদিন সকালে বাথরুমে যাবার সময়, রামলালের নজর এড়িয়ে, ঘড়িটা ময়লার টিনে ফেলে দেয়।

তারপর রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

অন্য কোন পথ খোলা না পেয়ে এভাবে আন্দাজেই ঢিল ছুঁড়তে হয়েছিল ওদের। ভেবেছিল জীবনে অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা তো এখনও ঘটে, এক্ষেত্রে তবু তো পূর্ব-পরিকল্পিত ছক আছে। একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখাই যাক না।

ভাগ্য ওদের ভালই বলতে হবে। তবে ধাঙ্গড়টি নয়, ডাস্টবিন থেকে ঘড়িটা চলে গিয়েছিল ময়লা কাগজ-কুড়োন একটি ছেলের হাতে।

ধাঙ্গড়টি রোজের মত টিন থেকে আবর্জনা নিজের টিনে ঢেলে বাইরে এনে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলেছিল। ঘড়িটা তার নজরে পড়েনি।

ধাঙ্গড়টি কয়েক পা না যেতেই ময়লা কাগজ কুড়িয়ে বেড়ান একটি ছেলে, নেড়ে-চেড়ে কাগজ সংগ্রহ করতে গিয়ে, হঠাৎ ঘড়িটা পেয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা নিয়ে ও বাড়ি ফিরে আসে। কাগজের বস্তাটা বাড়ীতে রেখে ছোট একটা ঘড়ির দোকানে যায়। ওর নিজের হাতঘড়ি ব্যবহারের প্রশ্নই আসে না, গিয়েছিল ঘড়িটা বিক্রী করতেই। কুড়িয়ে পাওয়া ঘড়ি শুনে দোকানের মালিক একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। কিন্তু, হয়তো ভেবে দেখলেন, উনি না হলেও এরকম একটা প্রায় নতুন ঘড়ির লোভ অনেকেই ছাড়তে পারবে না। কেউ না কেউ ছেলেটাকে ঠকিয়ে কিনে নেবেই।

ছেলেটিকে বসতে বলে, ঘড়ির যন্ত্রপাতিগুলো একবার দেখে নেবার জন্য ঘড়িটা খুললেন উনি।

খুলেই অবাক! ঘড়ির যন্ত্রপাতি কোথায়? সে জায়গায় ছোট্ট একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ কে যেন গুঁজে রেখেছে।

কিছু না ভেবেই কৌতূহলে কাগজটা খোলেন ভদ্রলোক। খুলেই চমকে ওঠেন। ছেলে চুরির মত সাংঘাতিক একটা ব্যাপারের সঙ্গে

অজ্ঞাতে এভাবে জড়িয়ে পড়ায় ভয় পেয়ে যান। অনেক ভেবে ঠিক করেন, ব্যাপারটা পুলিসকে জানানোই ভাল।

ছেলেটিকে আর একটু বসতে বলে বাড়ির ভেতর গেলেন উনি। নিজের ছেলেকে ঘটনাটা বলে, চিঠিটা নিয়ে থানায় যেতে বললেন।

থানা খুব দূরে নয়, মিনিট পনেরর মধ্যেই জীপ নিয়ে পুলিস অফিসার মিঃ সোম এসে হাজির হলেন দোকানে।

পুলিশ দেখেই কাগজ-কুড়োন ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেল।

অফিসার দোকানে ঢুকেই মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, ঘড়ি কোন্ ছেলেটি নিয়ে এসেছে?

মালিক ছেলেটিকে দেখিয়ে দিলেন।

ছেলেটি আচমকা অফিসারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

—বিশ্বাস করুন হুজুর, ঘড়িটা আমি চুরি করিনি, ময়লা কাগজ কুড়োতে গিয়ে একটা ডাস্টবিনের মধ্যে পেয়েছিলাম।

অফিসার ওকে অভয় দিয়ে বললেন, চুরি না করে থাকলে তোর ভয়ের কিছু নেই। কোন্ ডাস্টবিন থেকে তুলেছিস, দেখিয়ে দিতে পারবি?

ছেলেটি উৎসাহে বলল, পারব হুজুর। আমাকে নিয়ে চলেন, আমি এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি।

অফিসার মিঃ সোম ছেলেটিকে জীপে তুলে নিলেন। জায়গামত এসে দূর থেকে ডাস্টবিনটা দেখিয়ে দিল ছেলেটি।

এরপর, আজ সকালে যে ধাঙ্গড়টি এ অঞ্চলে ডিউটিতে ছিল, তাকে খুঁজে বের করতেও অসুবিধে হল না।

আপাততঃ ছেলেটি এবং ধাঙ্গড়টিকে পুলিস নিজেদের হেপাজতে রেখে, আশপাশের বাড়িগুলোর ওপর নজর রাখতে শুরু করল।

সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা প্রায় সব বাড়িগুলোতেই ঢুঁ মেরে এল। সব বাড়িই নির্ভেজাল গৃহস্থ বাড়ি। শুধু একটা বাড়ির সাততলার ওপরের একটা ফ্ল্যাটকে কেমন যেন সন্দেহজনক বলে মনে হল।

সেদিন সন্ধ্যার পরই পুলিস অফিসার সাদা পোষাকের কয়েকজন পুলিস নিয়ে আন্দাজে হানা দিলেন সেই ফ্ল্যাটে।

ঠিক মিনিট পনের আগেই বাগচীদারাও রোজের মত পৌঁছেছিলেন ওখানে। পুলিসের তাই খুব বেশি কষ্ট করতে হল না। পুরো দলটাকেই হাতেনাতে ধরে ফেললেন তাঁরা।

এরপর পিকলু আর পাপাইকে উদ্ধার করতেও যে তাঁদের কোন অসুবিধে হল না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

পরদিন প্রায় সব দৈনিক পত্রিকাতেই পিকলু আর পাপাইয়ের ছবিসহ সংবাদটির পূর্ণ বিবরণ ছাপা হল।

সকলেই আশা করছে, সাহসিকতার জন্য এ বছরের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারটি পিকলুর ভাগ্যেই ঝুলছে।

আমরাও সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি।

পিকলুর প্রথম গোয়েন্দা অভিযান



পিকলুর বন্ধু পাপাই কলকাতায় ওর মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করত। ওদের নিজেদের বাড়ি ছিল বর্ধমানের এক গ্রামে। বড় কোন ছুটি পড়লেই পাপাই গ্রামের বাড়িতে চলে যেত।

পিকলুর অনেক দিন থেকেই সখ ছিল, পাপাইয়ের সঙ্গে এক ছুটিতে ওদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যায়। কিন্তু, ওরা দুই ভাই বোন হলেও, এক ছেলে হলে যা হয়, মা-বাবা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না, যে ছেলে বড় হয়েছে। এবার বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হবার পর, পিকলু রীতিমত তাই বিদ্রোহ করে বসল। এবার সে পাপাইয়ের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য ওদের গ্রামে বেড়াতে যাবেই। পরীক্ষার ফল বেরুলেই ক্লাস টেনে উঠবে। তখন তো আর মা-বাবা অস্বীকার করতে পারবে না, যে পিকলু বড় হয়েছে!

ওর মেজাজ দেখে মা-বাবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিয়েছিল। কিন্তু

বারে বারে বলে দিয়েছিল, যেন দিন সাতেকের বেশী না থাকে। শুধু তাই নয়, গোপনে পাপাইয়ের মা-বাবাকেও সেই মর্মে একটি চিঠি দিয়েছিল যেটা টের পেয়েছিল পিকলু অনেক পরে। দিন দশেক পেরিয়ে যাওয়ার পর।

এই প্রথম কলকাতার বাইরে গ্রামে এসে ভীষণ ভাল লাগছিল পিকলুর। এতদিন শুধু গল্পেই পড়েছে, অথবা ছবিতে দেখেছে গ্রাম, এখন চাক্ষুষ গ্রাম দেখে এমন মজে গিয়েছিল যে, সাতদিন পেরিয়ে গেলেও কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ওর মা-বাবার চিঠিটার কথা তখনই বলেছিলেন পাপাইয়ের মা। অবশ্য ইতিমধ্যে উনিও নাকি পিকলুর মাকে লিখে দিয়েছেন, পিকলু দিব্বি আছে। ও আসায় আমাদেরও খুব ভাল লাগছে, ওর জন্য কোন চিন্তা নেই। আর ক'দিন পরে ওকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

পাপাইয়ের মা-র কাছ থেকে খবরটা পেয়ে বেশ নিশ্চিন্তবোধ করছিল পিকলু। যাক, তাহলে আরো ক'টা দিন দিব্বি মজাসে গ্রামের এই শান্ত পরিবেশে কাটিয়ে যাওয়া যাবে। পড়াশুনো নেই, সামনে পরীক্ষা নেই, দিনগুলো তাই ভালই কাটছিল আড্ডা আর হৈচৈয়ের মধ্যে। বাড়তি আকর্ষণ ছিল সঙ্গে নিয়ে আসা এক গাদা ডিটেকটিভ বই। দিনে সময় পেত না, রাত্রে পাপাই ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে গোগ্রাসে তাই বইগুলো গিলত পিকলু। ডিটেকটিভ বই হাতে পেলে যেন এক অন্য জগতে চলে যায় ও।

একদিন রাত প্রায় একটা নাগাদ, পাপাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ মনে হল পিকলুর, কে যেন দরজায় নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। শোনার ভুল নয়তো? কান খাড়া করে পিকলু। না, শোনার ভুল নয়, আবারও সেই একই শব্দ! বাইরে থেকে কে যেন দরজায় নখের আঁচড় কাটছে।

মনে মনে সামান্য ভয় পায় পিকলু। পাপাইকে ডাকবে কিনা ভাবে। আবার সঙ্কোচ বোধ করে। পাপাই যদি পরে এ নিয়ে ঠাট্টা করে ওকে।

আবারও শব্দ। এবার আরো একটু জোরে। পিকলুর ব্যাপারটা সুবিধের মনে হয় না। এবার সত্যিই ভয় পেয়ে যায়। সব সঙ্কোচ ত্যাগ করে তাই আস্তে পাপাইয়ের গা ধরে ধাক্কা দেয়, এই পাপাই? পাপাই? একবার ওঠ তো, বাইরে কেমন যেন একটা বিশ্রী শব্দ হচ্ছে।

ঘুম জড়ানো চোখে উঠে বসে পাপাই। জিজ্ঞেস করে, কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আবার শব্দ। আর সেই সঙ্গে একটা চাপা কেঁউ কেঁউ আওয়াজ। দুই বন্ধুর মধ্যে একবার চোখাচোখি হয়। পাপাই বলে, একটা কুকুরের বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে না?

পিকলু সামান্য লজ্জা পায় এবার। মাথা নেড়ে বলে, তাইতো মনে হচ্ছে; চলতো দেখি।

দুই বন্ধু বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজা খোলে। যা সন্দেহ করেছিল, তাই! সুন্দর ফুটফুটে একটা দেশী কুকুরের বাচ্চা। দেখে পোষা বলেই মনে হয়। বাইরে থাকার অভ্যাস নেই বলেই বোধহয় দরজা আঁচড়াচ্ছিল। কিন্তু এত রাত্রে এল কোত্থেকে?

দুই বন্ধু পরামর্শ করে বাচ্চাটাকে ঘরে নিয়ে আসে। বারান্দা থেকে একটা পুরনো চটের থলি সংগ্রহ করে টেবিলের নিচে পেতে দেয়। বাচ্চাটাকে শুইয়ে দেয় তার ওপর। বাচ্চাটাও দিব্বি আয়েশে নিঃশব্দে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে সেখানে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল পর দিন সকালে।

পাপাইয়ের মা কুকুর-টুকুর একদম সইতে পারেন না। ওঁর ধারণা, কুকুর নানারকম অসুখ-বিসুখের জার্ম ছড়ায় বাড়িতে। উনি তাই পত্র-পাঠ বাচ্চাটাকে বাইরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসার নোটিশ জারি করলেন।

অগত্যা পিকলু আর পাপাইয়ের তাই বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। কিন্তু এইটুকু বাচ্চা, তাই রাস্তায় বেওয়ারিশ অবস্থায় ছেড়ে দিতে মন সরছিল না ওদের। দুই বন্ধু মিলে তাই পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে এল, পোষা কুকুর যখন, একটু খোঁজ করলেই মালিকের খোঁজ পাওয়া যাবে। যে বাড়ির কুকুর সেই বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে এলেই

নিশ্চিন্ত।

কিন্তু অনেক খোঁজ করেও মালিকের হদিশ পেল না ওরা। শেষ-পর্যন্ত রাস্তায় ছেড়ে আসার কথা ভাবছে যখন, তখনই খবরটা পেল গ্রামের গোয়ালাদের একটি মেয়ের কাছ থেকে। এরকম একটা কুকুরের বাচ্চা নাকি দজ্জাল ঠাকরুণের বাড়িতে দেখেছে সে।

কে দজ্জাল ঠাকরুণ?

পরিচয়টাও মেয়েটিই দিল। গ্রামের শেষে, নদীর পাড়ে, যে ভাঙ্গাচোরা জমিদার বাড়িটা আছে, সেই বাড়িটাই আগলে আছেন বৃদ্ধা দজ্জাল ঠাকরুণ। একা একটি চাকর নিয়ে থাকেন সেখানে। দারুণ মুখরা মহিলা। ওঁর দাপটে বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না কেউ। ছোটরা আমটা, জামটা চুরি করতে গেলে তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে। বুড়ির নতুন নামটা তাদেরই দেওয়া—দজ্জাল ঠাকরুণ। কেউ কেউ বলে, ডাইনী বুড়ি। মেয়েটির এক বন্ধু রোজ সকালে ও বাড়িতে এক পো করে দুধ দিয়ে আসে। তার সঙ্গেই দু'একদিন গিয়ে এরকম একটা কুকুরের বাচ্চা নাকি সেখানে দেখেছে মেয়েটি।

তবু একটা হদিশ তো পাওয়া গেল! কুকুরের বাচ্চাটাকে নিয়ে সেই ভাঙ্গা জমিদার বাড়ির দিকেই রওনা হল ওরা।

বাড়িটা গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে। আশেপাশে সেরকম কোন বাড়ি-ঘরও নেই। পেছনেই নদী। নদীর ভাঙ্গনে বাড়ির বেশ কিছুটা অংশ নদীর গর্ভে গিয়েছে। দীর্ঘদিন কেউ বসবাস না করায় বাড়িটা দেখে মনে হয় যেন পোড়োবাড়ি। সামনের কিছুটা অংশও ভেঙ্গে পড়েছে। নোনাধরা দেওয়ালে গাছ গজিয়েছে। আশেপাশে ছোট ছোট জঙ্গল, ঝোপঝাড়।

এরই ভেতর শুধু সদর দরজার সামনে কিছুটা পরিষ্কার অংশ। দজ্জাল ঠাকরুণের এটা প্রবেশপথ বলেই বোধ হয়। সদর দরজার ঠিক ওপরের একটা ঘরের জানলায় ছেঁড়া একটা কাপড়ের পর্দা ঝুলছে। বুড়ি বোধহয় ওঘরেই থাকেন।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ওরা।

দেখে একটু অবাক হয়, দরজায় একটা পুরনো বড় তালা ঝুলছে। তালার সঙ্গে আটকানো একটা কাগজের টুকরো।

পিকলু এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে কাগজটার সামনে ঝুঁকে পড়ে। কাগজটায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা, মা কয়েক দিনের জন্য তীর্থে যাচ্ছেন, আজ থেকে আর দুধ দিতে হবে না।

পাপাই দেখে হতাশ হয়ে বলল, যাঃ বুড়িও হাওয়া? কুকুরটাকেও তো চোখে পড়ছে না! বাচ্চাটাকে কি করবি তাহলে? এখানেই ছেড়ে দিয়ে যাবি?

পিকলুর গোয়েন্দাগল্প পড়া মন ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে। ও আদৌ কুকুরের প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলতো? বুড়ি এমন আচমকা তীর্থে যাওয়া ঠিক করলেন যে, দুধ দেওয়া মেয়েটাকেও জানিয়ে যেতে পারলেন না!

পাপাই ঠাট্টার সুরে বলল, ব্যাস, মাথায় গোয়েন্দাগিরির পোকাগুলো নড়া-চড়া শুরু করল তো! আরে বাবা, বুড়ো হলে এমনিই লোকের অনেক কিছু খেয়াল থাকে না। তাছাড়া কোথাও বেড়াতে যাওয়ার উত্তেজনা থাকলে আমরাও কত কিছু ভুলে যাই না? হয়তো গোছ-গাছের উত্তেজনায় খেয়াল ছিল না, যাত্রা করার সময় মনে পড়ায় কাজের লোকটিকে বলেছিলেন, ঐ চিরকুটটা লিখে তালায় ঝুলিয়ে দিতে।

সামান্য স্তিমিত সুরে পিকলু বলল, অসম্ভব না···কিন্তু—

পাপাই এবার তাড়া দেয়, যথেষ্ট হয়েছে, আর 'কিন্তু' নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোর। অনেক বেলা হয়েছে, এবার চলতো, আশ-পাশটায় একবার খুঁজে দেখি কুকুরটার হদিশ পাওয়া যায় কিনা। বাচ্চাটাকে তাহলে ওটার কাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফেরা যায়।

পাপাইয়ের অজান্তেই তালা থেকে চিরকুটটা ততক্ষণে খুলে নিয়েছে পিকলু। বলল, তাই চল, খুঁজে দেখি।

বাড়ির আশ-পাশটায় বেশ কিছুক্ষণ ওরা 'আয় আয়, তু-তু' হাঁক পেড়ে খুঁজল কুকুরটাকে। কিন্তু কুকুরের কোন পাত্তা নেই। বাচ্চাটাকে

নিয়ে কি করা যায় ভাবছে, হঠাৎ একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে বাচ্চাটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কোল থেকে নামার জন্য একটা চাপা অস্থিরতাও যেন।

বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতেই একছুটে সেটা সামনের ঝোপটার ভেতরে ঢুকে গেল।

ওরাও পিছনে পিছনে গিয়ে দেখে, ঝোপের পাশে একটা গর্তে বেশ বড় একটা কুকুর মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আর বাচ্চাটা ডেকে ডেকে ওটার চারপাশে ঘুরছে।

পাপাই বলল, নিশ্চয়ই এটাই বাচ্চাটার মা ছিল। কিন্তু ব্যাপার দেখছি সবদিকেই গুবলেট! মাটাও আর মরবার সময় পেল না?

পিকলুর গোয়েন্দা মন আরো সজাগ হয়ে উঠেছে এতক্ষণে।



ব্যাপারটা কাকতালীয়, না অন্য কোন রহস্য আছে এর পেছনে ? একই দিনে বাড়ির বৃদ্ধা তীর্থে গেলেন, কুকুরটাও মারা গেল ?

পাপাই বলল, কুকুরটার ওপর ঝুঁকে কি দেখছিস অমন করে ?

পিকলু গম্ভীর মুখে বলল, কুকুরটার মাথায় সামান্য রক্তের দাগ দেখছি। ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল বলে মনে হয় !

পাপাই বলল, অসম্ভব না। ফুল বা ফল চুরি করতে এলে শুধু বুড়ি নয়, কুকুরটাও বোধহয় ছেলেদের তাড়া করত, ওরাই তাই ইঁট-ফিট ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে কুকুরটাকে।

পিকলু বলল, হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস ?

পাপাই বলল, কি ?

—ওদিকের ঐ দাগটা দেখে মনে হচ্ছে, কুকুরটাকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছিল এখানে।

পাপাই ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, সেটা তো হতেই পারে। ছেলেরা কুকুরটাকে মরে যেতে দেখে হয়তো ভয় পেয়ে ওটাকে টেনে ওখানে ফেলে রেখে গেছে ! ওসব অবান্তর কথা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বাচ্চাটার কি করবি বল ?

পিকলু বলল, বাড়ি নিয়ে যাওয়া যখন সম্ভব না, এখানেই রেখে দিয়ে যেতে হবে। খিদে পেলে আপ্‌সেই কোনখানে গিয়ে জুটবে।

পাপাইয়ের প্রস্তাবটা মন্দ মনে হল না। বেলা অনেক হয়েছে। মা-ও নিশ্চয়ই ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এতক্ষণে। ওরা তাই বাচ্চাটাকে ওখানেই রেখে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

কিন্তু বাড়ি ফিরে এসেও, পিকলু কিছুতেই মন থেকে চিন্তাটিকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না, বুড়ির তীর্থে যাওয়া, কুকুরটার মৃত্যু—সবই কি স্বাভাবিক ? নাকি এর পেছনে কোন গোপন রহস্য আছে ?

ওর চোখমুখ দেখে পাপাই ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল, কিন্তু ইচ্ছে করেই নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করল না ওকে।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে পিকলু বলল, চল না, আজ নদীর ও

দিকটায় একবার ঘুরে আসি।

পাপাই বলল, ঐ ভাঙ্গা জমিদার বাড়িটায় ?

পিকলু ছোট করে বলল, ক্ষতি কি ?

পাপাই এবার বেশ জোর দিয়েই আপত্তি জানাল। বলল, ওসব পাগলামি মাথা থেকে নামা তো ? তোর কি ধারণা, সবই তোর ডিটেকটিভ গল্প ? সব কিছুর পেছনেই রহস্য থাকবে ?

পিকলু নির্লিপ্ত গলায় বলল, হয়তো নেই, কিন্তু একবার ঘুরে আসতে দোষ কি ? এসব প্রাচীন বাড়ি তো লোকে কৌতূহলবশতঃও দেখতে যায়।

পাপাই বোঝে, নিজের চোখে একবার বাড়িটা পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না পিকলু। রাতদিন এক অলীক রহস্যই ওর মাথায় ঘুরবে। চাপা বিরক্তি নিয়েই বলল তাই, পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। চল !

আবার সেই নির্জন পোড়ো বাড়িটার সামনে এসে হাজির হয় ওরা। দরজায় তখনও একইভাবে তালাটা ঝুলছে।

পিকলু বলল, চল না, একবার বাড়ির ভেতরটা দেখে আসি।

পাপাই বিরক্ত হয়ে বলল, তালা ভেঙ্গে ?

পিকলু বলল, তালা ভাঙ্গতে যাব কেন ? পেছন দিকে নদীর ভাঙ্গনে বাড়িটার অনেকটা অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে। প্রাচীরটাও পড়ে গিয়েছে। ওদিক দিয়েই অনায়াসে বাড়িতে ঢোকা যাবে।

পাপাই হাতজোড় করে বলল, মাপ কর বাবা ! ঐসব ইটের স্তূপে কয় পুরুষের সাপের বাস কে জানে ! আমি ওর ভেতর নেই।

পিকলু নির্লিপ্তভাবে বলল, তাহলে তুই এখানে অপেক্ষা কর, আমি একবার ঘুরে আসি।

পাপাইয়ের পক্ষে সেটাও মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ওরই দায়িত্বে ওদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে পিকলু। এখানে কোন একটা বিপদ-আপদ ঘটলে ওর আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। অগত্যা বন্ধুকে অনেক বুঝিয়েও নিরস্ত করতে না পেরে, পিকলুর সঙ্গী হতে

হল ওকে।

পেছন দিকটা ভাঙ্গা ইটের স্তূপে প্রায় দুর্গম হয়ে ছিল। তার ওপর সন্ধ্যে হয়ে আসছে! সঙ্গে টর্চ নেই। অনেক কষ্ট আর কসরত করে শেষপর্যন্ত বাড়ির ভেতর পেঁছাল ওরা।

সামনে একটা ভাঙ্গা-চোরা সিঁড়ি। এদিকের সিঁড়িটা কেউ ব্যবহার করে বলে মনে হয় না। পাপাইয়ের সন্দেহ হচ্ছিল, সিঁড়ির ধাপে পা দিলেই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে ওটা।

তবু দারুণ সতর্ক হয়ে পাপাইকে নিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়েই দোতলায় উঠে গেল পিকলু। দোতলার বেশির ভাগ ঘরেই দরজা জানালা নেই। খাঁ-খাঁ করছে ঘরগুলো। ইঁদুর, বাদুড়ের বাসস্থান এখন।

সেই খালি ঘরগুলোর সামনে দিয়ে বুড়ির ঘরটার সামনে এসে থামল ওরা।

ঘরটার দরজা খোলা। ভেতরে একটা দড়িতে টাঙানো কিছু জামা কাপড়। ঘরের এক কোণে কিছু বাসনকোসন। একটা উনুন। ঘরের একটা দেওয়ালের পাশে রং চটা বড় টিনের ট্রাঙ্ক।

পিকলু গম্ভীর গলায় পাপাইকে একবার জিজ্ঞেস করল, কি মনে হচ্ছে?

পাপাই আস্তে বলল, ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই মনে হচ্ছে। সদর দরজায় তালা ঝুলছে, অথচ বুড়ির ঘর খোলা!

পিকলু ভারিক্কী চালে বলল, রহস্যটা তাহলে আর একটু ঘন হল তো? এবার চল, ভেতরে চল। একবার সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা যাক!

নিঃশব্দে বুড়ির ঘরে গিয়ে ঢুকল ওরা। চারদিকে একবার সতর্ক, সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিল পিকলু। পাপাইয়ের কেমন যেন ভয় ভয় করছিল।

হঠাৎ এককোণে কিছু কুকুরের লোম চোখে পড়ল পিকলুর। দ্রুত এগিয়ে গেল সেদিকে। লোমগুলো হাতে তুলে নিল। নতুন একটা সন্দেহ মাথায় এল ওর। কুকুরটাকে যে মেরেছে, তার সঙ্গে এখানে

ধস্তাধস্তি হয়নি তো কুকুরটার ? ঘরে নতুন লোক দেখে হয়তো আক্রমণ করেছিল কুকুরটা !

ইতিমধ্যে পাপাইও একটা চন্দনকাঠের বোতাম খুঁজে পেয়েছে ঘরের মেঝেতে। সেটা নিয়ে পিকলুর কাছে এসে দাঁড়াল ও। বলল, দেখতো, এটা কি ? একটা জামার বোতাম বলে মনে হচ্ছে না ?

বোতামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পিকলু একবার গম্ভীর গলায় বলল শুধু, হুঁ।

রহস্য প্রসঙ্গে ততক্ষণে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছে পিকলু।

পিকলুর সন্দেহটা পাপাইও আর উড়িয়ে দিতে পারছিল না। নিজের ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করতে শুরু করে ও।

পিকলু ততক্ষণে ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র নেড়ে-চেড়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছে। বুড়ির বিছানার কোণটা একটু ওলটাতেই নতুন একটা জিনিস পেয়ে গেল। একটা মানিঅর্ডারের কুপন। কুপনের উল্টোপিঠে ছেলেদের হাতের লেখায় একটি চিঠি : ঠাকুমা, পাঁচশ' টাকা পাঠালাম। যদি রাগ না পড়ে থাকে, তাহলে কোন গরীব দুঃখীকে দিয়ে দিও টাকাটা। প্রণাম নিও। ইতি, মন্টু।

পাপাইও ঝুঁকে পড়ে চিঠিটা পড়ছিল। হঠাৎ বুড়িকে কে পাঁচশ' টাকা পাঠাতে পারে বুঝতে পারল না ও।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। পিকলু বলল, যা পেয়েছি যথেষ্ট। এরপর বাড়ি ফিরতে অসুবিধে হবে। চল যাই।

উত্তেজনায় সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হল না দুই বন্ধুর। ঘটনার পেছনে এক গভীর রহস্য আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। রাশি রাশি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে এতদিন কল্পনাতেই নিজেকে এক দুঃসাহসী গোয়েন্দা ভেবে আনন্দ পেত পিকলু। কিন্তু আচমকা বাস্তবেও যে এধরনের এক রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কোনদিন, ভাবতে পারেনি ও।

পাপাই অবশ্য একবার বলেছিল, এসব ঝুটঝামেলার মধ্যে না গিয়ে থানায় খবর দেওয়াই ভাল। কিন্তু ও রাজি হয় নি। তাহলে

আর নিজেদের কৃতিত্ব কোথায় ? ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে ও, যা করার নিজেরাই করবে। নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগে রহস্যের জাল ছিন্নভিন্ন করে তাক্ লাগিয়ে দেবে সবাইকে। প্রস্তাবটার পেছনে উত্তেজনা থাকায় পাপাইও শেষ পর্যন্ত আপত্তি করে নি।

সামনে এখন কটি প্রশ্ন : সত্যিই কি বৃদ্ধা তীর্থে গেছেন, না নিহত হয়েছেন ? নিহত হলে হত্যাকারী কে ? হত্যার কারণ কি হতে পারে ? আর, ওই মন্টু লোকটি কে ?

মন্টুর পরিচয়টা পরদিন একটু ঘুরেই বের করে ফেলল ওরা। সম্পর্কে মন্টু দজ্জাল ঠাকরুণের একমাত্র নাতি। প্রাচীন এক জমিদার বংশের একমাত্র বংশধর। ঠাকুমার প্রশ্রয়ে খুব অল্পবয়সেই বখে গিয়েছিল মন্টু। তারপর একদিন ঠাকুমার একমাত্র সম্পত্তি, বিয়ের স্মৃতি, সোনার টিকলিটা চুরি করে শহরে পালিয়ে গিয়েছিল। সেও প্রায় বছর দশেক আগের কথা। ইতিমধ্যে ঠাকুমাও প্রচণ্ড চটে গিয়ে আর খোঁজ করে নি নাতির।

এতদিন পরে যে স্বেচ্ছায় ঠাকুমাকে টাকা পাঠিয়েছে, সে তো আর লুকিয়ে এসে ঠাকুমাকে হত্যা করে যেতে পারে না ! তাই সন্দেহের তালিকা থেকে পিকলুরা আপাততঃ মন্টুর নামটা বাদ রাখল।

পরদিন বিকেলে আবার বাড়িটায় গেল ওরা। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও টাকাটার কোন হদিশ পেল না। তবে পোস্ট না করা একটা পোস্টকার্ডের সন্ধান পেল এক কুলুঙ্গিতে। হাতের লেখা আঁকাবাঁকা। পড়ে মনে হল, বাড়ির চাকরটির লেখা। বউয়ের কাছে দজ্জাল ঠাকরুণ প্রসঙ্গে নানান অভিযোগ, নালিশ আর উষ্মা জানিয়ে লেখা একটি চিঠি। হয়তো ভুলে পোস্ট করে নি, বা করার সময় পায়নি।

চিঠিটা থেকে একটা কথা জানতে পারল ওরা, লোকটির নাম মাখন। মাখনের ঠিকানাটাও জানতে পারল ওপিঠের ঠিকানাটা দেখে।

পিকলুদের সব সন্দেহ ঘনিয়ে এল এবার মাখনকে কেন্দ্র করে। বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে মাখনও নিখোঁজ। এবং একমাত্র মাখনের পক্ষেই জানা সম্ভব যে, বুড়ির নামে পাঁচশ' টাকা এসেছিল।

পরদিন ওরা যুক্তি করে, মা-কে মালতীদীঘি দেখতে যাওয়ার নাম করে, দুটো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাখনের উদ্দেশ্যে। প্রায় মাইল পনের দূরের একটা গ্রামে পৌঁছে মাখনের সন্ধানও পেল।

কিন্তু তাতেও কোন কাজ হল না। মাখনের কাছ থেকে জানা গেল, বুড়ির ব্যবহারে ইদানিং ও তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। নেহাৎ ওর বাপ-ঠাকুর্দা জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন বলে কৃতজ্ঞতা বশতঃই এতদিন ও-বাড়িতে ছিল। বুড়িকে একেবারে নির্বান্ধব দেখে মায়াও হত। কিন্তু বুড়ি ওকে একদিন বাপ-বাপান্ত করে গাল দেওয়ায়, ওর চরিত্র নিয়ে খোঁটা দেওয়ায়, ও সেই মুহূর্তে কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল।

সাক্ষী সাবুদের কাছ থেকে ওর দেশে ফেরার যে দিনটা জানা গেল, সেটা মানিঅর্ডার আসার আগের দিন।

তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য পিকলু একটা কাগজে মাখনের পুরো নাম ঠিকানাটা লিখিয়ে নিল ওকে দিয়ে। পরে চিঠিপত্র দেবার প্রয়োজন হতে পারে বলে।

সেই হাতের লেখা বুড়ির ঘরে পাওয়া পোস্টকার্ডের হাতের লেখার সঙ্গে মিলে গেল। কিন্তু সদর দরজার তালায় লটকানো সেই চিরকুটের লেখার সঙ্গে মিলল না।

সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরার পথে পিকলু পাপাই, দুজনকেই কিছুটা হতাশ মনে হল। আবার যেন অগাধ জলে পড়ল ওরা। চিরকুটের লেখাটা তাহলে কার হতে পারে? বুড়ি কি মাখন চলে যাওয়ায় নিজেকে অসহায় বোধ করে, সংসারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, সত্যিই আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন তীর্থেই চলে গেছেন টাকাটা নিয়ে?

বাড়ি ফিরে পাপাইয়ের মার কাছে খবর পেল পিকলু, ওর মা ব্যস্ত হয়ে একটি রেজেস্ট্রী চিঠি পাঠিয়েছেন ওঁকে, পিকলুকে এবার সুবিধা মত পাঠিয়ে দেবার জন্য। খালি বাড়িতে নাকি ভীষণ খারাপ লাগছে মা-বাবার।

কিন্তু কেসটার কোন ফয়সালা না করে বাড়ি ফিরতে মন সরছিল

না পিকলুর। জীবনের প্রথম কেস ; তাও বানানো নয়, সত্যিই বিরাট রহস্যময় একটি ঘটনা। তাই নিজেই মাকে একটা রেজেস্ট্রী চিঠি দিয়ে আরো ক'দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবে ঠিক করল।

পরদিন পাপাইকে নিয়ে পোস্টঅফিসে গেল পিকলু চিঠিটা রেজেস্ট্রী করতে। গ্রামের পোস্ট অফিস, তাই খুব একটা ভীড় ছিল না।

পাশের কাউন্টারে অল্প বয়সী এক কর্মচারী ভদ্রলোক গ্রামের নিরক্ষর একটি লোকের বেগার খেটে দিচ্ছিলেন মানিঅর্ডার ফর্মের উল্টো পিঠে লোকটির বয়ানে ওর বক্তব্য লিখে দিয়ে। চিঠি শেষ করে ঠাট্টার সুরে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক, বউকে কি জানাবে ? আশীর্বাদ, ভালবাসা, না অন্য কিছু ?

অফিসের দু'চার জন হেসে উঠল ওঁর কথা শুনে। সামান্য কৌতুকে পিকলুও ফিরে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

আর, চমকে উঠল ভদ্রলোকের পাঞ্জাবীটার দিকে চোখ পড়ায়।

র-কটনের ছাই-ছাই রঙের একটি পাঞ্জাবী। বোতামগুলো চন্দনকাঠের, কিন্তু সবচেয়ে ওপরের ঘরের বোতামটা নেই।

মুহূর্তে বুড়ির ঘরে পাওয়া বোতামটার কথা মনে পড়ে যায় পিকলুর। উত্তেজনায় টান টান হয়ে ওঠে দেহের শিরাগুলো। পাপাইকে একটু পাশে সরিয়ে এনে ব্যাপারটা জানায় ওকে।

পাপাইও শুনে চমকে ওঠে। দ্রুতপায়ে আবার দু'জনে কাউন্টারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক বুঝতে না পারেন এমনভাবে, একটু সামনে ঝুকে, আড়চোখে মানিঅর্ডারের ফর্মে লেখা চিঠিটা দেখতে থাকে।

দেখেই বুঝতে পারে, সদর দরজার তালায় ঝোলানো সেই চিরকুট আর এই চিঠি একই লোকের হাতের লেখা।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় নিজেদের চিঠিটা রেজেস্ট্রী না করেই পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। তারপর নির্জন খাল পাড়ে বসে গভীর আলোচনায় ডুবে যায়।

এখন কি করণীয় ? এর বেশি এগোনো ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর পরের ধাপই হওয়া উচিৎ ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে, চাপ দিয়ে আসল রহস্য উন্মোচন করা। কিন্তু সে তো ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই সবদিক চিন্তা করে, পুলিসকে পুরো ঘটনাটা জানানোই সমীচীন বলে মনে হল ওদের।

থানার দারোগাবাবু প্রথমে ওদের পাত্তাই দিতে চাইলেন না। বললেন, রাতদিন বসে বসে গোয়েন্দা কাহিনী পড় বুঝি ? আর চারদিকে রহস্য খুঁজে বেড়াও !

কিন্তু পুরো ঘটনাটা পিকলু পরপর সাজিয়ে, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেবার পর কিছুটা সচেতন হলেন যেন ভদ্রলোক। বললেন, ঠিক আছে, তোমরা তাহলে এখানে একটু বস, আমি নিজে গিয়ে বুড়ির ঘরটা একবার সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে আসছি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দারোগাবাবু যখন ফিরলেন, তখন তিনিও প্রচণ্ড উত্তেজিত। আরো কিছু নতুন সূত্রও নাকি আবিষ্কার করে এসেছেন উনি।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

পুলিস গিয়ে গ্রেপ্তার করল সেই কর্মচারী যুবকটিকে। পুলিসের চাপে পড়ে সব স্বীকার করল সে। পোস্ট অফিসে চাকরি করে বলেই বুড়ির নামে টাকা আসার কথাটা জানতো সে। একটু খোঁজ নিয়ে আর একটা খবরও জেনেছিল, বুড়ির পুরনো চাকরটি বুড়িকে ছেড়ে দেশে চলে গেছে। অর্থাৎ বুড়ি এখন বাড়িতে একদম একা।

কিন্তু বুড়িকে খুন করার ইচ্ছে নাকি ওর একদম ছিল না। তাই বুড়িকে ভয় দেখানোর জন্য একটা পেন্সিল কাটা ছুরি শুধু সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

বুড়ি ভয় পেয়ে টাকাটাও নাকি বের করে দিয়েছিল। কিন্তু সবকিছু গোলমাল করে দিল বুড়ির কুকুরটা। হঠাৎ কোত্থেকে সেটা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তাই হাতের সামনে একটা হাতুড়ী পেয়ে সেটাই বসিয়ে দিয়েছিল সে কুকুরটার মাথায়।

কিন্তু বুড়ি ততক্ষণে চিৎকার করতে করতে ছুটতে শুরু করেছে। পেছনের দিকের সিঁড়িটার দিকে ছুটছিল বুড়ি। হয়ত ভেবেছিল, ওদিক দিয়ে নেমে গিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছাতে পারলে জেলেরা ওর চিৎকার শুনে এগিয়ে আসবে।

কিন্তু সে সুযোগ আর পায়নি বুড়ি। সিঁড়ির দুই ধাপ নেমেই পা পিছলে হুড়মুড় করে নিচে পড়ে গিয়েছিল।

আততায়ী যুবকটি ছুটে নিচে নেমে এসে দেখে, বুড়ির দেহে প্রাণ নেই। ভয়ে তাই বুড়ির মৃতদেহটা সে পেছনের একটা পরিত্যক্ত কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিস আবার ছুটে যায় সেই পোড়ো বাড়িতে। পরিত্যক্ত কুয়োটার মধ্যে সত্যিই খুঁজে পায় বুড়ির মৃতদেহ।

তারপর ?

চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায় ঘটনাটি নিয়ে। গোটা গ্রাম উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।

আর ধন্য ধন্য পড়ে যায় পিকলুর নামে। দলে দলে লোক এসে তারিফ করে যেতে শুরু করে পিকলু আর পাপাইয়ের উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসের।

এভাবেই রাতারাতি গ্রামে বিখ্যাত হয়ে যায় ক্ষুদে গোয়েন্দা পিকলু সান্যাল। আর ওর সুযোগ্য সহযোগী—পাপাই চৌধুরী।



সল্টলেকে তরুণীর মৃত্যু।

রোজের মতই খবরের কাগজের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার ওপর চোখ বুলিয়ে খেলার পৃষ্ঠায় যেতে গিয়ে, সংবাদটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে পিকলুর। একটু থেমে পুরো সংবাদটা পড়ে ও।

সল্টলেকে তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যু। গতকাল গভীর রাতে মিঃ সোমানী নামে এক খ্যাত ব্যবসায়ীর বাড়ির একটি বন্ধ ঘরে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা সোমানীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘরটি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল এবং ঘরের দরজা জানলা অটুট ছিল। পুলিশ এই মৃত্যুর রহস্য সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

সংবাদটা পড়ে ছোট্ট একটা ধাক্কা খায় পিকলু। বুঝতে পারে দুর্ঘটনাটা রাকেশদের পরিবারেই ঘটেছে। কেননা ওর খুড়তুতো বোন ললিতা সোমানীর নামটাও মিলে যাচ্ছে। একদিন স্কুল ছুটির পর

রাকেশ পিকলুকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বিশাল বাড়ি। বাড়ির সর্বত্র রুচির পরিচয়। ওর খুড়তুতো বোন ললিতার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এম. এ. পাশ করে সবে ল কলেজে ভর্তি হয়েছে তখন ললিতাদি। দেখতে বেশ সুন্দর! স্মার্ট। পিকলুর সঙ্গে বসে অনেক গল্প করেছিল। রাকেশের মুখে পিকলু একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা শুনে খুব মজা পেয়েছিল যেন ললিতাদি। বলেছিল, ভালই হল, কোন-দিন কোন সমস্যায় পড়লে তোমার শরণাপন্ন হওয়া যাবে।—পিকলুর খুব লজ্জা লাগছিল। মনে মনে কিছুটা অস্বস্তিও বোধ করছিল, ওর এই সিরিয়াস দিকটা ললিতাদি এমন হাল্কাভাবে নেওয়ায়।

রাকেশের সঙ্গে পিকলুর বন্ধুত্ব খুব বেশি দিনের নয়। মাত্র বছর দুয়েক আগে অন্য একটি স্কুল থেকে রাকেশ এসে ওদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু এই দু'বছরের মধ্যেই রাকেশের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ওর। এর একটা কারণ হয়তো রাকেশও ওর মত গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত। রাকেশের কাছ থেকে প্রচুর ইংরাজী বই এনে পড়েছে ও।

সংবাদটা পড়ে পিকলুর মনে হল, একবার রাকেশদের বাড়ি যাওয়া উচিত। ওদের এত বড় একটা দুর্ঘটনার খবর পেয়েও রাকেশকে একবার সমবেদনা না জানিয়ে এলে সেটা অন্যায় হবে।

রবিবার, তাই স্কুলের প্রশ্ন ছিল না। চা জলখাবার খেয়ে, মাকে বলেই রাকেশদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল পিকলু।

রাকেশদের বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি ছাড়াও আরো কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আন্দাজেই বুঝল পিকলু, ওদের আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ওর পরিচয় জানতে চাইল। রাকেশের বন্ধু শুনে ওকে ভেতরে যেতে দিল।

রাকেশ চুপচাপ ওর নিজের ঘরে বসেছিল। একটু আগেই যে কাঁদছিল সেটা বোঝা যায় মুখ-চোখ দেখে। খুব ভয়ও পেয়ে গেছে ও। গোটা ব্যাপারটার বাস্তবতা এখনও যেন ঠিক উপলব্ধি করতে পারছে না।

সান্ত্বনা দিয়ে দু-চার কথা বলে পিকলু জানতে চাইল আসল ঘটনাটা কি।

রাকেশ যা জানাল তার মর্মার্থ—ওর বাবা মিঃ সোমানীর পুরোন জিনিসপত্র সংগ্রহের নেশা আছে। ব্যবসাসূত্রে মিঃ সোমানীকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরতে হয়। যেখানেই যান সেখানকার ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন। সে-সব জিনিস দিয়ে বাড়িতেই সুন্দর একটা 'কিউরিও রুম' করেছেন। ছোটখাট একটা একজিবিসন রুম যেন। মাঝে-মাঝে বাইরের লোকও দেখতে আসে সে-সব সংগ্রহ। ওঁর বিনানুমতিতে সে ঘরে বাড়ির কাজের লোকজনেরও প্রবেশ নিষেধ।

কাল মাঝরাতে একবার ঘুম ভাঙলে মিঃ সোমানীর চোখে পড়ে, ঘরটায় আলো জ্বলছে। কৌতূহলে ঘরটার সামনে গিয়ে দেখেন, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ দরজা না খোলায় উনি সবাইকে ডাকেন। মিঃ সোমানীর সন্দেহ হয়, বাইরের কেউ কিছু চুরি করতে এসেছিল বোধহয়, একা আর ভয়ে বেরুতে পারছে না। একজন ভৃত্যকে তাই পেছনের রেইন-পাইপ বেয়ে উপরে উঠে দেখতে বলেন, ঘরে কাউকে দেখা যায় কিনা।

ভৃত্যটি ওপরে উঠে আতঙ্কে চিৎকার করে বলে, বাবু ঘরের মেঝেতে ললিতা দিদিমণি পড়ে আছেন। চারদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মিঃ সোমানী তক্ষুনি পুলিশকে ফোন করেন। তারা এসে দরজা ভেঙ্গে দেখে, সত্যিই তাই। ললিতাদি মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছে। বুকে একটা ছুরিকাঘাতের গভীর ক্ষত।

পিকলু রুদ্ধশ্বাসে ঘটনাটা শুনে যাচ্ছিল। রাকেশ থামলে জিজ্ঞেস করল, ঘরে আর কাউকে পাওয়া যায় নি ?

রাকেশ বলল, না, ঘরের অন্য দরজা জানালাগুলোও ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দিদিকে কেউ যদি খুন করে থাকে, তার তো পালানোর একটা পথ চাই! পুলিস অফিসাররা তাই বুঝতে পারছেন না—

ওর কথা শেষ হবার আগেই পিকলু বলল, আত্মহত্যার কেস নয় তো ?

রাকেশ বলল, পুলিশেরও সে-রকম একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু দিদির মৃতদেহের পাশে বা ঘরের কোথাও কোন ছুরি বা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র পাওয়া যায় নি। তাছাড়া আত্মহত্যা করতে হলে নিজের ঘরে না করে বাবার কিউরিও-রুমেই বা করতে যাবে কেন?

সমবেদনা জানাতে এসেছিল পিকলু, কিন্তু ঘটনা শুনে ওর রহস্য-সন্ধানী মনটা সজাগ হয়ে ওঠে।

রাকেশকে বলল তাই, কিউরিও রুমটা একবার দেখা যায়?

রাকেশ বলল, কিছুক্ষণ আগে ডেড্-বডিটা পুলিশ সরিয়ে নিয়ে গেলেও ঘরটা পুলিশ পাহারায় আছে। ঢুকতে দেবে কিনা সন্দেহ।

পিকলু বলল, না হয় বাইরে থেকেই দেখব। চল না।

রাকেশ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, চল।

ঘর থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই হঠাৎ গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার মিঃ সোমের সঙ্গে দেখা! উল্টোদিক থেকে আসছিলেন উনি। মাসকয়েক আগে ও আর পাপাই নিজেদের বুদ্ধিতে খুনীর কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর থানায় আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। সবার সামনেই সেবার পিকলুর পিঠ চাপড়ে ওকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মিঃ সোম।

পিকলুকে এখানে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে?

পিকলু বলল, এটা আমার বন্ধু রাকেশের বাড়ি। ললিতাদি ওর খুড়তুতো বোন ছিলেন। সকালে কাগজে খবরটা দেখে—

সোম বললেন, সহানুভূতি জানাতে এসেছিলে?

পিকলু বলল, হ্যাঁ। এই কেসটার ভার কি আপনার ওপর পড়েছে?

মিঃ সোম একটু মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, বাড়ি যাচ্ছ?

পিকলু বলল, যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনাকে দেখে অন্য একটা লোভ হচ্ছে।

একটু মুচকি হেসে সোম বললেন, বুঝেছি; তদন্তের কাজে আমার

সঙ্গে থাকতে চাও, এই তো ?

মাথা নেড়ে মৃদু সম্মতি জানায় পিকলু।

সোম বললেন, একমাত্র তুমি বলেই রাজী হচ্ছি। এস।

তারপর কি ভেবে যেন বললেন, কিউরিও-রুমটা দেখেছ ? ঘটনা-স্থলটা ?

পিকলু বলল, এখনও দেখিনি।

সোম বললেন, তাহলে আগে ঐ ঘরটা দেখে নাও। নাহলে কেস্‌টা ফলো করতে পারবে না।

পিকলুকে নিয়ে মিঃ সোম কিউরিও রুমটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিউরিও রুমটি আকারে মাঝারি। গোটা ঘরটাই বিভিন্ন বিচিত্র কিউরিওতে সাজানো। ঘরের মাঝখানে উঁচু একটি বেদীর ওপর বেশ বড় একটা ড্রাগনের মূর্তি। দেখেই বোঝা যায় চীন থেকে সংগ্রহ। বেদীর গায়ে পাঁচ ধাপ সিঁড়ি। ড্রাগনটাকে হাত দিয়ে দেখতে হলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়।

সিঁড়ির ঠিক নিচেই চক্ দিয়ে একটা বৃত্ত আঁকা। সোম বললেন, মৃতদেহটি সিঁড়ির নিচে ঐ জায়গায় পড়েছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল বডিটা সিঁড়ি থেকে নিচে গড়িয়ে পড়েছিল!

পিকলু বলল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে ড্রাগনটা পরীক্ষা করেছেন ?

সোম বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু ড্রাগনের মূর্তিটা ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ল না। ড্রাগনের গায়েও না।

পিকলু বলল, আপনাদের কি ধারণা—হত্যা, না আত্মহত্যার কেস্ ?

সোম বললেন, ঠিক এই মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। ঘরের দরজা জানলা সব ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। মার্ডার কেস্ হলে খুনী পালাল কোন পথে ? আবার আত্মহত্যার ঘটনা হলে অস্ত্রটা তো ঘরের ভেতরই থাকার কথা, কিন্তু সেরকম কিছু ঘরে পাওয়া যায় নি। এখন পর্যন্ত তাই মৃত্যুটা রহস্যজনক বলেই মনে হচ্ছে।

পিকলু বলল, আমি একবার ড্রাগনটা একটু দেখে আসতে পারি ?

সোম বললেন, যাও, কিন্তু ওটার গায়ে হাত দিও না। এখনও

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা সব কিছু দেখে যাননি।

পিকলু সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ড্রাগন-মূর্তিটা দেখল। সন্দেহজনক বা উল্লেখযোগ্য সেরকম কিছু নজরে পড়ল না ওর।

পিকলু নেমে এলে মিঃ সোম বললেন, এ বাড়িতে আমার আর একটু কাজ বাকি আছে। আর একজনকে জেরা করতে হবে। কিন্তু সে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চল পাশের ঘরটায় গিয়ে বসি।

কিউরিও রুমের পাশের ঘরটা মিঃ সোমানীর একটা ক্ষুদে অফিস। এখানে বসে নিজের জরুরী কাজ করেন উনি। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয় বলে শোবার ঘরগুলো থেকে একটু দূরে এই আলাদা ঘরটা বেছে নিয়েছেন।

কথাটা মিঃ সোমের কাছ থেকেই জানল পিকলু। ঘরে ঢুকে নিজে একটা চেয়ারে বসে পিকলুকে আর একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, এবার বল, কি ভাবছ এই কেস্‌টার ব্যাপারে?

সলজ্জ হেসে পিকলু বলল, আমি আবার কি ভাবব! আমি অপেক্ষা করছি আপনার কাছ থেকেই শুনব বলে। তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এটা একটা খুনের কেসই। অবশ্য সেক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়, খুনী পালাল কোন পথে।

মিঃ সোম গম্ভীর গলায় বললেন, ভবিষ্যতে তুমি হয় তো একজন পাকা গোয়েন্দা হবে। সে সম্ভাবনা তোমার আছে। তাই তোমাকে ছোট্ট একটা লেস্‌ন দিই, পিকলু। এ ধরনের কেসে খুনী কিভাবে হত্যা করল বা কোন পথে পালাল তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে সব সময় উল্টো দিক দিয়ে ভাবতে শুরু করবে। যদি হত্যার কেস্ হয় তাহলে খুন করার পেছনে কার কার কি ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে। একই সঙ্গে একথাও মনে রাখবে, তদন্তে সম্ভাব্য কাউকেই সন্দেহের বাইরে রাখতে নেই। এমন কি তোমার দারুণ শ্রদ্ধেয় বা নিকট বন্ধু হলেও না। কেস্‌টা আমারও কেন যেন মার্ডার কেস্ বলেই সন্দেহ হচ্ছে।

পিকলু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনি তাহলে এক্ষেত্রে কাকে

কাকে সন্দেহের তালিকায় আনতে চান ?

একটু হেসে বললেন সোম, এখনও তালিকা তৈরী করতে শুরু করিনি। ধর, তোমাকে যদি সে দায়িত্ব দেওয়া হত, তাহলে ঠিক এই মুহূর্তে তুমি কাকে কাকে তালিকাভুক্ত করতে চাইতে ? একেবারে নিরপেক্ষভাবে বল।

সামান্যক্ষণ ভেবে পিকলু বলল, যাঁর নাম প্রথম মনে আসছে তাঁর পক্ষে এ-কাজ করা অসম্ভব।

সোম কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলেন, কে তিনি ?

স্বর সামান্য নামিয়ে পিকলু বলল, মিঃ সোমানী। ললিতাদির জ্যাঠামশায়।

—কেন ?

—মিঃ সোমানীরা দুই ভাই ছিলেন। ছোট ভাইয়ের মেয়ে ললিতাদি। রাকেশের কাছে শুনেছি, ললিতাদির বাবা বিয়ের বছর তিনেক পরই মারা গিয়েছিলেন। ললিতাদির মা মারা গিয়েছিলেন জন্মের বছর খানেক পর। মিঃ সোমানীদের বর্তমান ব্যবসা বা বিষয়-সম্পত্তি সবই রাকেশের ঠাকুর্দা, অর্থাৎ মিঃ সোমানীর বাবার হাতে গড়ে তোলা। তাই ঠাকুর্দা মারা যাবার পর সেই বিষয় সম্পত্তির অংশীদার থাকছেন মাত্র দুজন—মিঃ সোমানী ও ললিতাদি।

সোম বললেন, ঠিকই ভেবেছ। তাহলে মিঃ সোমানীর ক্ষেত্রে কাজটা অসম্ভব বলে ভাবছ কেন ?

পিকলু বলল, আমি রাকেশের কাছেই শুনেছি, মিঃ সোমানী পিতৃ-মাতৃহীন ললিতাদিকে নিজের মেয়ের চেয়েও আদরযত্নে মানুষ করে-ছিলেন। এবং রাকেশের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন ললিতাদিকে।

পিকলুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সোম বললেন, একটা কথা তুমিও জান পিকলু, কেননা তুমিও এখন খুব ছোট নেই, যে ছেলেমেয়েরা বড় হলে তাদের নিজস্ব কিছু ইচ্ছে অনিচ্ছে, নিজস্ব মতামত বা ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। যার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে মা-বাবা অভিভাবকদের সংঘাত দেখা দেয়। রাকেশ তো তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে হয়। ওর কাছ থেকে

কোনদিন এমন কোন আভাস পেয়েছ, যাতে মিঃ সোমানী আর ললিতাদির সঙ্গে কোন মতান্তর—

পিকলু বলল, বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। আপনার কথা শুনে সে-রকম একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

উৎসাহে সামান্য নড়ে বসলেন মিঃ সোম। বললেন, কি ঘটনা বল তো।

পিকলু স্বর নামিয়ে বলল, রাকেশ একদিন স্কুলে একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে আমাকে বলেছিল, জানিস পিকলু, কথাটা কাউকে বলিস না, ললিতাদি না, একটা সাহেব ছেলেকে বিয়ে করবে শুনছি। আমি প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, ছেলেটি ইতালিয়ান। কিন্তু ওর বাবা, মিঃ সোমানীর নাকি এ বিয়েতে মত নেই। দিদিকে নাকি এজন্য বকেওছেন তিনি।

মিঃ সোম বললেন, ছেলেটির নাম জান ? বা কোথায় থাকে ?

পিকলু বলল, নামটা জানি না। তবে রাকেশ যেন বলছিল, ভদ্রলোক এখানে পড়াশুনোর কি একটা ব্যাপারে এসেছেন। বোধহয় রিসার্চের কাজে।

মিঃ সোম কি যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ইতালিয়ান, রিসার্চের কাজে এসেছে। এটুকু থেকেই হয়তো ছেলেটির হদিস বের করে নেওয়া যাবে! ঠিক আছে, এখানেই অপেক্ষা কর। আমি একটু ঘুরে আসছি! আর একটা কথা, রাকেশের সঙ্গে এই কেসের ব্যাপারে কোন আলোচনা কর না।

পিকলু আস্তে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সত্যিই ছেলেটিকে খুঁজে বের করতে খুব বেশি কষ্ট করতে হল না মিঃ সোমের। ছেলেটির নাম শুনলেন—স্পিনেত্তি মোরাভিয়া। ভারতীয় দর্শনের ওপর কাজ করতে এসেছে। এক বন্ধুর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসাবে থাকে। সেই ঠিকানাও পাওয়া গেল।

মোরাভিয়ার বয়স বছর ত্রিশেক। বেশ ধীর স্থির বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

ললিতার মৃত্যু সংবাদটা জানত না ও। মিঃ সোমের মুখে সংবাদটা

শুনে চমকে উঠল। মুখ দেখেই বুঝলেন সোম, প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে ছেলেটি। মিঃ সোমের পরিচয় পেয়ে সবিনয়ে বলল, বলুন, কি জানতে চান ?

নানা ধরনের প্রশ্ন এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে মিঃ সোম জানতে পারলেন, ললিতা ও মোরাভিয়ার ভেতর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ললিতার জ্যাঠামশাই মিঃ সোমানীর প্রচণ্ড আপত্তি ছিল এ বিয়েতে। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, চাল-চুলোহীন কোন ফিরিঙ্গি ছেলেকে বিয়ে করলে ললিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না তিনি।

ললিতা এমনিতে খুব শান্ত মেয়ে হলেও প্রচণ্ড জেদী ছিল। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল ওর। জ্যাঠার কথায় প্রথমে ও ঠিক করেছিল, এক জামা-কাপড়ে বেরিয়ে আসবে ও বাড়ি থেকে। তারপর মোরা-ভিয়াকে বিয়ে করে ইতালি চলে যাবে।

কিন্তু পরে ও ভেবে দেখল, এভাবে বোকার মত অভিমান করে বেরিয়ে আসবে কেন ? তার বদলে জ্যাঠার কাছে ওর সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দাবী করবে। ওর ন্যায্য পাওনা বুঝে নিয়ে সেই সম্পত্তি বিক্রী করে, মোরাভিয়াকে বিয়ে করে, ওর সঙ্গে ইতালি চলে যাবে। এ নিয়েও নাকি জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য ঘটেছিল ললিতার।

এই সংবাদগুলো সংগ্রহ করে মিঃ সোমানীর বাড়ি ফিরতে মিঃ সোমের প্রায় ঘণ্টা খানেক কেটে গেল।

ইতিমধ্যে পিকলু রাকেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আঁচ করতে পেরেছিল, ললিতাদির সঙ্গে মিঃ সোমানীর কোন একটা ব্যাপার নিয়ে গোলমাল চলছিল কিছুদিন ধরে। ললিতাদি ইদানীং ভীষণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। কারো সঙ্গে আগের মত হৈ-চৈ করে কথাবার্তা বলতেন না। দেখেই বোঝা যেত, একটা মানসিক উত্তেজনার ভেতর আছেন। একদিন নাকি বাইরে থেকে ঘরের ভেতর দিদি আর বাবার প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি শুনেছিল রাকেশ।

মিঃ সোমকে ফিরতে দেখে পিকলু ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল

আবার। সোমের মুখ দেখেই অনুমান করল, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। কিন্তু সোম নিজে থেকে কিছু না বলায় পিকলুও আগ বাড়িয়ে সে কথা জানার চেষ্টা করল না।

মিঃ সোম ফিরেছেন দেখে বাড়ির একজন লোক এসে জানাল, যমুনাদি এখন কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। আপনার কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে এখন করতে পারেন।

মিঃ সোম উঠে দাঁড়িয়ে পিকলুকে বললেন, একটু বস, আমি আসছি।

এই যমুনাদির কথাও রাকেশের কাছে আগে শুনেছে পিকলু। রাকেশের ঠাকুর্দার আমল থেকে এ বাড়িতে কাজ করছেন মহিলা। ওর বাবাকে পর্যন্ত নাম ধরে 'তুমি' বলে ডাকেন। একেবারে শৈশবে ললিতাদির মা মারা যাওয়ায় এই যমুনাদিই ওঁকে বুকে করে মানুষ করেছিলেন। ললিতাদিকে তাই নিজের মেয়ের চেয়েও ভালবাসেন উনি। ললিতাদিও মা বলতে ওকেই বোঝেন। ললিতাদির এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে তাই ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছেন নাকি যমুনাদি।

মিঃ সোম যমুনাদির সঙ্গে দেখা করতে গেলে পিকলু আবার ঘটনাগুলো মনে মনে সাজানোর চেষ্টা করে। এইমাত্র শুনে এল, মিঃ সোমানীর সঙ্গে কি নিয়ে নাকি ইদানিং ললিতাদির গোলমাল চলছিল। সেটা কি ওঁর বিয়ে নিয়ে? বিয়ের পর নিজের সংসার পাতার আগে, ললিতাদির পক্ষে দাদুর সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দাবী করা অসম্ভব নয়। সেটা মিঃ সোমানীর পক্ষেও সহ্য করা সহজ নয়। তাছাড়া ললিতাদি নিহত হয়েছেন মিঃ সোমানীর কিউরিও রুমে। তাহলে কি সত্যিই এর পেছনে মিঃ সোমানীরই কোন হাত আছে?—

কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় পিকলুর। অস্বস্তি বোধ করে। ভাবে, যাকগে এ নিয়ে আমার এত মাথা ঘামানোর কি আছে? মিঃ সোমের মত পুলিশ গোয়েন্দারাই তো দায়িত্ব নিয়েছেন রহস্য উন্মোচনের। সুযোগ যখন পেয়েছি, নিঃশব্দে দেখে যাই ওঁরা এসব ক্ষেত্রে কিভাবে তদন্ত চালান। দেখে যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় সেইটুকুই লাভ।

মিঃ সোম তখন যমুনাদির ঘরে বসে তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করে

যাচ্ছিলেন। যমুনাদির কথা শুনে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেন যে, সত্যিই বিয়ে আর সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে ইদানিং খুবই মনোমালিন্য চলছিল মিঃ সোমানী ও ললিতার ভেতর। যমুনাদি নিজে শুনেছেন, কদিন আগে মিঃ সোমানী প্রচণ্ড চটে গিয়ে ললিতাকে বলেছিলেন, এর পরিণতি তুমি কল্পনা করতে পারছ না ললিতা। একটা ফিরিঙ্গি ছেলের উস্কানিতে আমাদের বংশের টাকা এভাবে তোমাকে তছনছ করতে দেব না আমি।

এ ছাড়াও যমুনার কাছ থেকে আরো একটা নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারলেন মিঃ সোম। ললিতার জন্মের পর ললিতার ঠাকুর্দা নাকি বিরাট দামী একটা হীরে দিয়ে ওর মুখ দেখেছিলেন, ওর জন্মের ক'দিন আগেই বিদেশের কি একটা ব্যবসায় বিশাল লাভ করেছিলেন বলে। কিন্তু ললিতার মা'র মৃত্যুর পর সেই হীরের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই হীরের কথাটা যমুনাদিই ক'দিন আগে জানিয়েছিল ললিতাকে।

মিঃ সোম বললেন, হীরের খবরটা শুনে ললিতাদেবী সে প্রসঙ্গে মিঃ সোমানীকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি এর ভেতর?

যমুনাদি বললেন, না। মনে মনে এতে দারুণ উত্তেজনা বোধ করলেও এ প্রসঙ্গে পিতৃতুল্য জ্যাঠামশায়কে কিছু জিজ্ঞেস করতে বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করছিল মেয়েটা। অবশ্য গতকাল খুব গোপনে হীরের সংবাদটা ওকে আমি জানিয়ে দিয়েছিলাম। ওকে আমি মেয়ের মত মানুষ করেছি বলে ওকে কেউ ঠকালে আমি কিছুতেই সেটা সহ্য করতে পারি না।

মিঃ সোম কৌতূহলে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, হীরের খবরটা আপনি জানলেন কি করে?

যমুনাদি বললেন, কত্তাবাবুর কাছ থেকেই। পরশু সন্ধ্যার পর উনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বুকে নাকি একটা যন্ত্রণাবোধ করছিলেন। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। উনি নিজেই ডাক্তার বোসবাবুকে ফোন করেছিলেন।

মিঃ সোম বললেন, তারপর ?

যমুনাদি বললেন, ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর কত্তাবাবু আমাকে ওঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাকে একটা মোড়া দেখিয়ে বসতে বলে বললেন, যমুনা, তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছ। আমাদেরও কোলে পিঠে করে মানুষ করেছ তুমি। তাই তোমাকেই বিশ্বাস করে একটা গোপন কথা বলে যাই। কেননা, ডাক্তার দেখে বলে গেলেন, আমার হার্টের অবস্থা খুব ভাল নয়। যখন তখন ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে যেতে পারে !

সোম বললেন, কি গোপন কথা উনি বললেন আপনাকে ?

যমুনাদি বললেন, ললিতাকে দেওয়া ওর ঠাকুর্দার সেই হীরের কথাটা।

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসেন সোম, কি বললেন ?

—বললেন, হীরেটা আমি ললিতার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই খুব গোপনে আমার কিউরিও ঘরের ড্রাগনটার মাথার পেছন দিকে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু ললিতাকে এখনই কথাটা বলার দরকার নেই। আমি হলপ্ করে বলতে পারি, ঐ ফিরিঙ্গি ছোকরাটা দু'দিন পর ওর সব টাকাকড়ি হাতড়ে নিয়ে ওকে সর্বস্বান্ত করে তাড়িয়ে দেবে। যদি তাই হয়, ওকে এক বস্ত্রে ফিরে আসতে হয়, তখন তাহলে হীরের কথাটা বল ওকে। কেননা এখন কথাটা ওকে জানালে শেষ সম্বল হীরেটাও মেয়েটার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আমি কালই উকিলবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি ওর প্রাপ্য অংশ ওকে বুঝিয়ে দেবার জন্য কাগজপত্র সব তৈরী করতে।

সোম বললেন, আচ্ছা, হীরের কথাটা কি ললিতাদেবী কোন সূত্রে জানতে পেরেছিলেন ?

যমুনাদি বললেন, আমি ওকে কথাটা গোপনে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

—কেন ?

—ভয়ে। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমিও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎই মনে হল, আমারও তো বয়স হল, সত্যিই যদি বিয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে ওকে সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে আসতে হয় !

আর তার ভেতর আমি মারা যাই! তাহলে তো হীরের কথাটা ললিতার না জানাই থেকে যাবে। আমিই তাই গোপনে কথাটা জানিয়ে রেখেছিলাম ওকে।

মিঃ সোম শুনে গম্ভীর হলেন। মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। এটাও মিঃ সোমানীর একটা চক্রান্ত নয় তো? হীরের কথাটা ললিতার কানে তুলে দিয়ে ওকে হীরেটা চুরি করতে প্রলুব্ধ করা!

হঠাৎ কি যেন মনে হওয়ায় যমুনাদিকে আবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, যে ডাক্তারবাবু ওঁকে দেখেছিলেন তাঁর ফোন নম্বরটা জানেন?

যমুনাদি বললেন, গত মাসেই সর্দিজ্বরে কয়েকদিন কষ্ট পেয়েছিলাম আমি। তখন ওঁর প্যাডের কাগজে একটা ওষুধের নাম লিখে দিয়েছিলেন উনি। তাতে ওঁর নাম ঠিকানা ফোন সবকিছুই লেখা আছে।

মিঃ সোম বললেন, দেখি একটু প্রেসক্রিপসনটা।

যমুনাদি বালিসের তলা থেকে কাগজটা বের করে দিলেন। মিঃ সোম দেখে বললেন, এটা আপাততঃ আমার কাছে থাক। পরে আপনাকে ফেরৎ দিয়ে যাচ্ছি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন উনি। ডাক্তারবাবুকে একটা ফোন করার জন্য মিঃ সোমানীর অফিস ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

ইতিমধ্যে একটা দারুণ জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছিল পিকলু। মিঃ সোমানীর অফিস ঘরে বসে এই কেসটার কথাই ভাবছিল, হঠাৎ নজরে পড়ল, যে-টেবিলে বসে কাজ করেন মিঃ সোমানী তার ডান দিকের একটা পায়ায় হঠাৎ একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না পিকলু। এ ঘরের কোন সুইচে হাত দেয় নি ও। তাহলে কি আলোটার কানেক্‌শন অন্য কোথাও আছে?

কি মনে হওয়ায় পিকলু দ্রুত উঠে পাশের কিউরিও রুমটার দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে দেখে, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটি, বোধহয় এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বিরক্ত ও ক্লান্ত বোধ করছিল বলেই ড্রাগনটার সিঁড়ির প্রথম ধাপটার ওপর বসে আছে। ওকে আসতে

দেখে পুলিশটি উঠে দাঁড়াল।

দ্রুত আবার অফিস ঘরে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখল পিকলু, লাল আলোটা নিভে গেছে। এ ঘরের সুইচগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। বোর্ডে অনেকগুলো সুইচ। সব ক'টা অফ্ করে দিয়ে একটা একটা করে সুইচ অন্ করতে শুরু করল পিকলু। তাতে হয় ঘরের কোন আলো জ্বলে উঠল, অথবা, ফ্যান চলতে শুরু করল। ঘরের সব আলো, সব ফ্যান চালু হবার পরও, লক্ষ্য করে দেখল পিকলু, সবচেয়ে নিচের সারিতে একটা সুইচ বাড়তি থাকছে। সেটাও অন্ করে লক্ষ্য করল, তাতে লাল আলোটা জ্বলল না। এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হল যে, ঐ লাল আলোর কানেক্সনটা কিউরিও রুমের সঙ্গে যুক্ত। এবং ঐ প্রথম ধাপটার সঙ্গে। ঐ ধাপটা কেউ পার হলেই এ ঘরের লাল আলোটা জ্বলে উঠে মালিককে সতর্ক করে দেয়, কেউ একজন বেদীটায় উঠছে! তাই যদি হয়, তাহলে এই বাড়তি সুইচটার প্রয়োজন কি? এটার সঙ্গেও ও ঘরের কোন কিছু যুক্ত নয়তো?

আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পিকলু। ও-ঘরের সামনে পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটিকে গিয়ে বলল, কাইণ্ডলি আমার সঙ্গে ঐ পাশের ঘরটায় একবার আসবেন? আমার একটু সাহায্য দরকার।

মিঃ সোমের সঙ্গে পিকলুর ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করেই বোধহয় এতে কোন আপত্তি করল না পুলিশটি। পিকলুর সঙ্গে পাশের ঘরটায় গেল সে। পিকলু তাকে সুইচবোর্ডটার সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আপনি দু'-তিনবার এই সুইচটা একটু থেমে থেমে অন্ আর অফ্ করুন তো! কিছু মনে করবেন না, একটা জরুরী প্রয়োজনে আপনাকে এই অনুরোধটুকু করছি।

পুলিশটি এতে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি করল না। পিকলু দ্রুত পায়ে পাশের কিউরিও রুমটায় গেল আবার। কিন্তু সে-রকম কিছু ব্যতিক্রম নজরে পড়ল না।

তাহলে কি এর সঙ্গেও সিঁড়ির কোন ধাপ গোপনে যুক্ত? কথাটা

মনে আসতেই পিকলু একটা ভারী চেয়ার এনে সেটা পর পর ধাপের উপর রেখে দেখতে লাগল। চেয়ারটা একেবারে শেষ ধাপে রাখা মাত্র অবাক হয়ে দেখল পিকলু, ড্রাগনের হাঁ থেকে একটা ছোট্ট তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দ্রুত বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐ ড্রাগনমূর্তির শেষ ধাপে কেউ উঠলে, এবং ওঘরের সুইচটা তখন অন্ করা থাকলে, গোপন ছুরিটা ড্রাগনের মুখ থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে আবার ভেতরে চলে যায়। ললিতাদির মৃত্যুর সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই তো?

মিঃ সোম অফিস ঘরে এসে দেখেন, পিকলু গভীর মনোযোগে কি যেন ভাবছে। পিকলুকে কিছু না বলে ফোনটার দিকে এগিয়ে গেলেন মিঃ সোম। প্রেস্‌ক্রিপসনটা দেখে ফোনের ডায়াল ঘোরালেন।

একবারেই ডাক্তারবাবুকে পেয়ে গেলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন, পরশু মিঃ সোমানীর কল্ পেয়ে এসে উনি পেসেণ্টের হার্টের অবস্থা কেমন দেখেছিলেন।

ওদিক থেকে ডাক্তারবাবু বললেন, হার্টের কোন গোলমালই ছিল না। ব্যাপারটা গ্যাস থেকে হচ্ছে সন্দেহ হওয়ায় আমি ওঁকে কয়েকটা জেলুসিল ট্যাবলেট খেতে বলে এসেছিলাম।

ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিলেন মিঃ সোম। পিকলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে। তুমি কি আমার সঙ্গে ফিরবে? আমি তোমাকে তোমাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি।

পিকলু বলল, তাই চলুন।

গাড়িতেও পিকলুকে খুব গম্ভীর আর অন্যমনস্ক দেখলেন মিঃ সোম। এক সময় তাই আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, কি ভাবছ, পিকলু?

পিকলু বলল, কিছু না। আপনি কোন ক্লু পেলেন?

সোম বললেন, পুরো ব্যাপারটাই আঁচ করতে পারছি, কিন্তু কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি নি।

পিকলু কৌতূহলী হয়ে বলল, বিশেষ কাউকে কি সন্দেহ করছেন আপনি ?

সোম গম্ভীর স্বরে বললেন, করছি। নানা দিক দিয়েই তাঁর ললিতাকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেজন্যই নিপুণ কৌশলে প্রলোভনের একটা জাল বিস্তার করে তিনি ললিতাকে ওঁর বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ললিতাও উত্তেজনার বসে সেই ফাঁদে পা দিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না, ললিতা নিহত হল কার বা কোন অস্ত্রের আঘাতে।

আচমকা উত্তেজনায় পিকলু কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল।

সোম লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যেন চেপে যাচ্ছ পিকলু। তোমার কিছু বলার থাকলে নির্ভয়ে আমাকে বলতে পার। কথাটা গোপনই থাকবে।

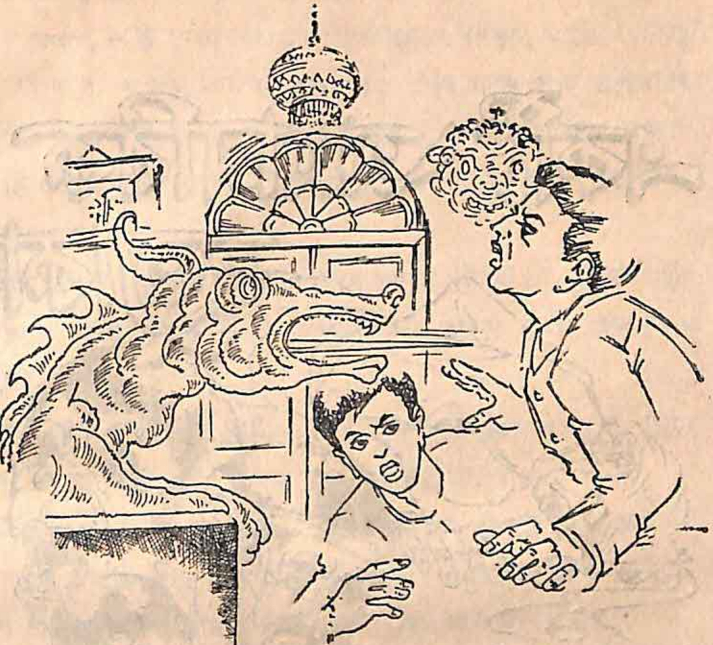
পিকলু একটু ইতস্ততঃ করে বলল, খুনের পদ্ধতিটা আমি খুজে বের করেছি, মিঃ সোম। কিন্তু রাকেশের কথা ভেবে বলতে ইতস্ততঃ করছিলাম।

মিঃ সোম ওর কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বললেন, আদর্শ গোয়েন্দা হতে গেলে মনে কোন রকম দুর্বলতা বা আবেগ রাখলে চলে না পিকলু। গোয়েন্দাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান। তুমি কি খুঁজে পেয়েছ বল আমাকে।

পিকলু লুকানো ছুরির ব্যাপারটা সবিস্তারে জানাল মিঃ সোমকে। শোনামাত্র তিনি গাড়ি ঘোরাতে বললেন। ফিরে চললেন মিঃ সোমানীর বাড়ি।

সেখানে পৌঁছে সোজা মিঃ সোমানীর অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সুইচটা দেখলেন। এবং পিকলুর পদ্ধতিতেই পরীক্ষা করে ড্রাগনের মুখের ভেতর লুকিয়ে থাকা ছুরিটার কার্যকারিতাও দেখলেন।

পিকলুকে বললেন অফিস ঘরে গিয়ে সুইচটা অফ্ করে আসতে। তারপর সিঁড়ির ধাপ বেয়ে শেষ ধাপে উঠে, সামনে সামান্য ঝুঁকে পড়ে ড্রাগনের মাথার পেছনের অংশে ছোট্ট একটা ঢাকনি দেখতে



পেলেন। সেটা খুলে দেখলেন, গর্তটা ফাঁকা। কিছু নেই। অর্থাৎ হীরেটা ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু একই সঙ্গে আর একটা জিনিস অনুভব করলেন মিঃ সোম। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকলে বুকটা গিয়ে ড্রাগনের মুখে ঠেকছে। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় কেউ ওঘর থেকে সুইচটা টিপে দিলে ড্রাগনের মুখের গোপন ছুরিটা এসে চোরের হৃদপিণ্ডে বিদ্ধ হবেই।

নিঃশব্দে বেদী থেকে নেমে এলেন মিঃ সোম। স্বর নামিয়ে পিকলুকে বললেন, ধন্যবাদ পিকলু, তোমার দৌলতেই এত সহজে হত্যা-রহস্যটা উন্মোচন করতে পারলাম। এবার বরং তুমি বাড়ি চলে যাও। কেননা এর পরের পর্বটুকু, রাকেশের বন্ধু হিসেবে, তোমার পক্ষে খুব প্রীতিপ্রদ হবে না। এবার মিঃ সোমানীকে গ্রেপ্তার করব আমরা।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পিকলু! রাকেশের কথা ভেবেই এত বড় একটা সাফল্যেও এতটুকু গর্বিত বা আনন্দিত বোধ করতে পারল না ও। বরং রাকেশের জন্য ওর দুঃখ হতে লাগল।

একটি অমানবিক হত্যাকাণ্ড



গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটি এলেই মনটা কেমন পালাই পালাই করে পিকলুর। এরকম লম্বা একটা ছুটি একঘেয়ে কলকাতায় কাটাতে ইচ্ছে করে না। ছুটিতে পড়াশুনোতেও মন বসে না। বাইরে আড্ডা মারা মা-বাবা খুব পছন্দ করেন না। আড্ডার নেশাটা অবশ্য পিকলুরও কম। সে সময়টা বাড়িতে বসে নতুন নতুন ডিটেক্‌টিভ বই পড়তে বরং বেশি ভাল লাগে। খেলার ভেতর পছন্দ ক্রিকেট। কিন্তু গ্রীষ্ম বা পুজোর ছুটি ক্রিকেট-সিজনের ভেতর পড়ে না। মাঝে মাঝে তাই বন্ধুদের সঙ্গে পার্কে ভলিবল খেলে বিকেলটা কাটিয়ে আসে। কিন্তু বাকী সময়টা যেন আর কাটতে চায় না। বই-ই বা কতক্ষণ পড়া যায়?

যে কোন বড় ছুটি শুরু হবার আগে থেকেই তাই পিকলু মা-বাবাকে ভজাতে শুরু করে বাইরে কোথাও কটা দিন একটু ঘুরে আসার জন্য। মা-বাবার দিক থেকে সেরকম সাড়া না পেলে শেষ পর্যন্ত

মান-অভিমান, হৈ-চৈ, কান্নাকাটিও শুরু করে দেয়। এত বড় দাদাকে কাঁদতে দেখলে ছোট বোন পিউও মা'র আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসে। কিন্তু গাট্টা খাওয়ার ভয়ে মুখে কিছু বলে না। শেষ পর্যন্ত প্রায় প্রতিবারই মা-বাবাকে হার মানতে হয়। আত্মীয়-স্বজন চারদিকে ছড়িয়ে থাকায় তাঁদেরই কারো বাড়ি থেকে ক'দিন ঘুরে আসার অনুমতি দিতে হয় পিকলুকে।

কিন্তু এবার পিকলুর হাব-ভাব দেখে সবাই অবাক। গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হতে চলল, কিন্তু পিকলুর দিক থেকে বাইরে যাবার যেন কোন গরজই নেই।

মা একদিন খাবার টেবিলে পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে পিকলু, এবার যে কোথাও যাবার নাম-টাম করছিস না?

পিকলু গম্ভীর মুখে বলল, অঙ্কের নম্বরটা গতবার ভাল ওঠেনি। এবার তাই ভাবছি পুরো ছুটিটা বাড়িতে থেকে অঙ্ক প্র্যাকটিস করব।

মা-বাবা দু'জনেই শুনে আশ্বস্ত হন। মনে মনে খুশিও হন।

ক'দিন পর ডাকে পিকলুর এক পিসিমার একটি চিঠি এল। অবশ্য বাবার নামে। বৃদ্ধা পিসিমা লালগোলার ওদিকে থাকেন। এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। পিসিমা ভাইকে লিখেছেন, গরমের ছুটিতে পিকলুকে একবার এখানে পাঠিয়ে দে না? আমাদের বাগানেই কত আম-কাঁঠাল হয়; কে খায়?

এই পিসিমা বাবার মামাতো বোন। আসা-যাওয়া কম থাকলেও চিঠি-পত্রে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। পিসেমশায় রিটায়ার করার পর ওখানেই জমি-জমা গুছিয়ে থেকে গেছেন।

বাবা পুরো চিঠিটা পড়ে একটু হেসে সেটা মা-র হাতে দিলেন। মা-ও পড়ে মুচকি হাসলেন।

পিকলু নিজের ঘরে শুয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। বাবা চিঠিটা নিয়ে পিকলুর ঘরে এসে বললেন, পিকলু, তোর রাঙা পিসির চিঠি এসেছে। খুব করে লিখেছেন তোকে একবার ওখানে পাঠিয়ে দিতে।

পিকলু নিরাসক্তভাবে বলল, এ-ছুটিটা এখানেই থাকব ভেবে-ছিলাম। পিসি কি খুব জোরাজুরি করেছেন যাবার জন্য ?

এবার দরজার আড়াল থেকে মা বেরিয়ে এসে বললেন, হ্যাঁ, খুবই জোর দিয়ে লিখেছেন। ইদানিং তোর শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, একেবারেই ক্ষিদে নেই, রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না—এসব শুনে দিদি খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

শুনে বিছানায় উঠে বসে পিকলু। এ-সংবাদ ও-ই পিসিমাকে জানিয়েছিল গোপন চিঠিতে। একবার বাইরে কোথাও ঘুরে এলে শরীরটা ভাল হতে পারে, সে আভাসও দিয়েছিল। কিন্তু পই-পই করে সাবধান করে দিয়েছিল, ওর অসুস্থতার কথা যেন ঘুণাক্ষরেও চিঠিতে উল্লেখ না করেন পিসি।

লজ্জায় মাথা নিচু করে বসে থাকে পিকলু। বাবা একটু হেসে বলেন, এত সব রোগ নিয়ে কলকাতায় না থেকে বাইরে কোথাও একটু ঘুরে আসাই ভাল। যা, ক'দিনের জন্য রাঙাদির ওখান থেকেই না হয় ঘুরে আয়। পরশু ওঁর এক দেওর আসছেন কলকাতায়। তাঁর সঙ্গেই তোকে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।

এমন সহজ অনুমতিতেও পিকলু মা-বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কী লজ্জা, কী লজ্জা! এ-সব বুড়ো-বুড়িদের নিয়ে এই এক সমস্যা, একটা গোপন কথা যদি বুদ্ধি করে পেটে রাখতে পারে! পিসির ওপর রীতিমত রাগ হতে শুরু করে পিকলুর।

পিসির বাড়ি পৌঁছে অবশ্য সব রাগ জল হয়ে যায়। বছর সাত-আট আগে বাবার সঙ্গে একবার বেড়াতে এসেছিল এখানে। তখন জায়গাটা প্রায় গ্রাম ছিল। এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। প্রচুর বড় বড় বাড়ি ঘর উঠেছে। কিন্তু চারপাশে গাছ-পালারও কমতি নেই। এ যে গ্রাম শহরের এক সুন্দর সংমিশ্রণ!

চিঠির কথা পিসিকে বলায় পিসি বললেন, ও মা, তোর এতবড় অসুখের কথা মা-বাবার কাছে গোপন করে বসে আছিস, সেকথা

জানাব না ওদের? আজকালকার মা-বাবারাও হয়েছে তেমনি, নিজেদের নিয়েই এত মত্ত, যে ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেবারও যেন সময় নেই!

পিসির আদর যত্নে এক দিনের ভেতরই পুরো সুস্থ হয়ে উঠল পিকলু। পিসি লক্ষ্য করে খুশি হন, পিকলু দু-বেলায়ই বেশ পেট পুরে খাচ্ছে, রাত্রে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে, সকাল বিকেল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

এখানে এসে পিকলুরও নতুন একটি সঙ্গী জুটে গেছে। ওরই সমবয়সী কুশল। পিসেমশায়ের এক ছোট বোনও এখানেই থাকেন। কয়েকটা বাড়ি পরেই তাঁর শ্বশুর বাড়ি। কুশল সেই বোনের ছেলে।

রোজই বিকেলে কুশল এসে ডেকে নিয়ে যায় পিকলুকে। পিকলুর গোয়েন্দাগিরির দু-একটি কাহিনী সেও শুনেছে। পিকলুকে তাই যেন কিছুটা সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে কুশল।

দিন সাতেক পর সবে জায়গাটা একটু একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছিল পিকলুর, এমন সময় একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনায় গোটা অঞ্চল সচকিত হয়ে উঠল।

গত রাতে নাকি এ অঞ্চলের এক আশি বছরের বৃদ্ধ নিজের ঘরে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আততায়ী ঘরে বন্দুকটি ফেলে গেছে। কিন্তু পুলিস বুঝতে পারছে না, আততায়ী পালালো কি করে? কেননা ঘরের সব দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। জানলার কোন গরাদও ভাঙ্গা ছিল না।

রহস্যজনক খুনের সংবাদে আবার চাঙা হয়ে ওঠে পিকলু। সকালের জল খাবার খেয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়ে কুশলের সন্ধানে। কুশল স্থানীয় ছেলে, ও সঙ্গে থাকলে ঘটনাটার অনেক কিছুই হয়তো জানা যাবে।

কুশল বাড়িতেই ছিল। ওদের বাড়িতেও তখন এই খুনের ঘটনাটা নিয়েই উত্তেজিত আলোচনা হচ্ছিল। সেখানেই নিহত ভদ্রলোক প্রসঙ্গে কিছু কথা জানতে পারল পিকলু।

ভদ্রলোকের নাম সুবিমল চৌধুরী। বয়স প্রায় আশি। এ-অঞ্চলের পুরোন বাসিন্দা নন উনি। ওঁর আদি বাড়ি ছিল নাকি এখান থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে একটি গ্রামে। সেখানে যথেষ্ট জমিজমার মালিক ছিলেন উনি। কিন্তু বছর দশেক আগে যে কোন কারণেই হোক, সেখানকার সব কিছু বিক্রী করে এখানে চলে এসেছিলেন। বহুদিনের পুরোন, সেই নবাব আমলের এই বাড়িটা কিনেছিলেন। তারপর নিজেই বিশাল প্রাচীর তুলে বেশ সুরক্ষিত করে তুলেছিলেন বাড়িটিকে। হয়তো গোটা বাড়িটায় একা থাকতেন বলেই।

কুশলদের বাড়ির আলোচনা থেকে আরো জানল, ভদ্রলোক নিতান্তই অসামাজিক চরিত্রের লোক ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী কারো সঙ্গে মিশতেন না। পারতপক্ষে বাড়ির বাইরে বেরুতেন না। মাসে একদিন ওঁকে ব্যাঙ্কে দেখা যেত। মাস-খরচের টাকা তুলতে নিজেই যেতেন তিনি।

বাড়িতে থাকার ভেতর ছিল একজন মালী, আর একজন কাজের লোক। হাট-বাজার, র‍্যাশন তোলা সব কাজ তারাই করত। কৌতূহলী প্রতিবেশীরা মাঝেমাঝে খোঁজ-খবর নিলেও লোক দুটির কাছ থেকে বাড়ির মালিক প্রসঙ্গে সে-রকম কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারত না। কেন না, ওদের সঙ্গেও নাকি বাবুর সে-রকম ঘনিষ্ঠতা নেই। কাজের কথা ছাড়া বাড়তি কোন কথা ওদের সঙ্গেও বলেন না কত্তাবাবু। প্রতিবেশী সবার কাছেই তাই এ বাড়িটা আর বাড়ির মালিক বরাবরই এক গভীর রহস্যে আবৃত ছিলেন।

কুশলকে নিয়ে বেরিয়ে এসে পিকলু টের পেল, জায়গাটা ছোট বলেই একটি হত্যাকাণ্ডেই চারদিকে বেশ তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। যেখানে যাচ্ছে, সেই একই আলেচনা। চায়ের দোকানে বিচ্ছিন্ন গবেষণা। বিভিন্ন লোকের মুখে ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ। তার ভেতর কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে বোঝা ভার।

একে একটি হত্যাকাণ্ড, তায় রহস্য-জনক,—মনে মনে পিকলু তাই অস্থির হয়ে ওঠে আসল ঘটনাটা জানার জন্য। কিন্তু ও এখানে নতুন,

কাউকেই চেনে না, তাই এমন কোন সূত্র হাতড়ে পেল না, যাঁর কাছ থেকে অবিকৃত ঘটনাটা জানা যায়। সেটা একমাত্র সম্ভব হত থানায় গেলে। কিন্তু ওর বয়সী নবাগত একটি ছেলেকে সে কাহিনী বলতে পুলিসের কী দায় পড়েছে! এই উত্তেজনার মুখে তাঁরা হয় তো ধমক দিয়েই বের করে দেবে ওকে থানা থেকে।

কিছুটা অতৃপ্তি ও মানসিক অস্থিরতা নিয়েই বাড়ি ফিরল পিকলু। ওর দেরী দেখে পিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। পিসেমশাইকে পাঠিয়েছিলেন কুশলদের বাড়ি ওর খোঁজে।

ও ফেরার একটু বাদেই ফিরলেন পিসেমশাই। পিকলুর বাড়ি ফেরার সংবাদটা কুশলের কাছেই পেয়েছিলেন তাই কোন দুঃশ্চিন্তা নিয়ে ফিরতে হয়নি। বরং কিছুটা যেন উত্তেজিত মনে হল পিসেমশাইকে।

পিসেমশায়ের বয়স হলেও ছেলেমানুষের মত কৌতূহল। অল্পতেই ভীষণ উত্তেজিত হন। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতেই পিসিমাকে ডেকে বললেন, বুঝলে, কেসটা বেশ জটিল শুনে এলাম। চৌধুরীবাবুর ঘরে যে রাইফেলটা পাওয়া গেছে সেটা নাকি কিছুদিন আগে একজন পুলিসের কাছ থেকে খোয়া গিয়েছিল। অনেকে আবার সন্দেহ করছে, এটা হত্যা না, হয় তো আত্মহত্যা। আজ সন্ধ্যার পর ভাবছি, একবার তপন দারোগার বাড়ি গিয়ে খাঁটি খবরটা নিয়ে আসব।

পিসিমা শুনে ধমকের সুরে বললেন, সব ব্যাপারেই তুমি এমন ছেলেমানুষের মত নাচতে শুরু কর কেন বলতো? খাঁটি খবর সংগ্রহ করে তোমার কোন সগ্যলাভ হবে শুনি?

কিন্তু খবরটা শুনে মনে মনে উৎসাহিত হয় পিকলু। বিশেষ করে এক গোপন রহস্যের গন্ধ পেয়ে।

বিকেলবেলা তাই চুপি-চুপি পিসেমশায়কে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গে এখানকার দারোগাবাবুর আলাপ আছে?

পিসেমশাই বললেন, আলাপ কিরে? রীতিমত খাতির আছে বল। আমার এক পুরোন ক্লাশফ্রেণ্ডের ছেলে তপন। বন্ধুটি অবশ্য মারা গেছে অনেকদিন হল।

গলার স্বর নামিয়ে পিসেমশাইকে বলল পিকলু, তাহলে চল না সন্ধ্যার পর একবার ওঁর ওখান থেকে ঘুরে আসি। খুনটা সম্বন্ধে আমারও খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমরা যাচ্ছি সেটা পিসিমাকে না জানালেই হবে।

শুনে পিসেমশাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, যাবি ? ঠিক আছে চল তাহলে। তোর পিসিমাকে না হয় বলব, তোকে নদীর পাড়ের শিব মন্দিরটা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। নদীটার ওপারেই বাংলাদেশ, জানিস তো ?

পিকলু বলল, জানি। কুশলের সঙ্গে গিয়েছিলাম একদিন ওদিকে।

পিসেমশাই বললেন, তাহলে তো ভালই হল। তোর পিসি জিজ্ঞেস করলে মন্দিরের বিবরণটাও দিতে পারবি।

অফ-ডিউটি থাকায় তপনবাবু বাড়িতেই ছিলেন। বয়স বেশি নয়, দেখে চল্লিশ মত মনে হয়। দেখেই বোঝা যায় বেশ চিন্তিত। কিন্তু পিসেমশাইকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বলেই ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। অন্দরে খবর পাঠালেন পিসেমশাই এসেছেন বলে।

পিসেমশায় পিকলুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তপনের। তারপর বললেন, এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমার কাছে খুনের ব্যাপারটা একটু শুনে যাই। বাজারে তো নানান গুজব, জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে ; কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে কিছুই বুঝছি না।

তপনবাবুর স্ত্রী নিজে এসে চা দিয়ে গেলেন। তপনবাবু খুনের যে বিবরণ দিলেন তা থেকে পিকলু খাঁটি তথ্যের কিছুটা জানতে পারল।

গতকাল রাতে হঠাৎ গুলির শব্দে নাকি ঘুম ভেঙে যায় বাড়ির মালীর। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখতে পায়, সদর দরজাটা খোলা। অন্ধকার বাগানের ভেতর দিয়ে দুটো ছায়ামূর্তি ছুটে বেরিয়ে গেল সেই দরজা দিয়ে। তাদের একজন লম্বা রোগা মত মনে হল। অন্যজন খুব বেঁটে। অল্প বয়সী ছেলের মত। বেঁটে ছায়াটা যেন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল লম্বা লোকটার পেছন পেছন। মালি

ছুটে গিয়েও ওদের কোন সন্ধান পেল না।

শব্দ আর মালির হৈ-চৈ শুনে বাড়ির কাজের লোকটিও জেগে গিয়েছিল। সদর দরজা বন্ধ করে ওরা মালিকের ঘরে ছুটে এসে জানলা দিয়ে দেখে, মালিক বিছানায় চোখ বুজে কুঁকড়ে শুয়ে আছেন। বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঘরের দরজা ছুটোয় ধাক্কা দিয়ে দেখল, ভেতর থেকে বন্ধ। কাজের লোকটিকে বাড়িতে রেখে মালীটি ছুটে এসে থানায় খবরটা জানায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

পিসেমশায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তখন ডিউটিতে ছিলে ?

তপনবাবু বললেন, না কিন্তু কিছুক্ষণ পর একজন পুলিস এসে খবর দেওয়ায় আমিও ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছিলাম।

পিসেমশায় বললেন, তুমি গিয়ে কি দেখলে ?

তপনবাবুর বিবরণ থেকে পিকলু জানতে পারল, উনি গিয়ে দেখেন, সেকেণ্ড অফিসার ততক্ষণে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছেন। ঘরের চারদিক পরীক্ষা করে দেখছেন। তপনবাবু ঘরে ঢুকে দেখলেন, মৃতদেহ একইভাবে বিছানায় শায়িত। বিছানার অনেকটা জায়গা জুড়ে রক্তের দাগ। ঘরের মেঝেতে একটা রাইফেল পড়ে আছে।

পিকলু হঠাৎই জিজ্ঞেস করে বসে, আচ্ছা, এই রাইফেলটা কি কিছুদিন আগে আপনাদের একজন পুলিসের কাছ থেকে ছিনতাই হয়েছিল ?

তপনবাবু পিকলুর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি করে জানলে ?

পিসেমশাই একটু হেসে হেসে বললেন, আমার কাছ থেকে শুনেছে। আমাদের এই পিকলুও কিন্তু এক ক্ষুদে গোয়েন্দা। ওরও নানা কীর্তি আছে। পরে বলব'খন এক সময়।

তপনবাবু একটু মজা পেয়ে বললেন, আচ্ছা।

পিকলু লজ্জা পায়। বলে, ওসব কিছু না আসলে আমি গোয়েন্দা গল্পের ভীষণ ভক্ত। দেশী-বিদেশী বই পেলেই পড়ি। তাই কোন খুন বা রহস্য-জনক ঘটনা ঘটলেই আমার ঘটনাটা জানার খুব

কৌতূহল হয়।

তপনবাবু বললেন, হ্যাঁ, কিছুদিন আগে আমাদের একজন পুলিস নাইট ডিউটিতে ছিল। সে হঠাৎ এসে খবর দিল, ওকে অন্ধকারে একা পেয়ে তিন-চারটি ছেলে এসে আচমকা আক্রমণ করে ওর রাইফেলটা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা চারদিকে তল্লাস শুরু করি। কিন্তু রাইফেলটার কোন হদিস পাই না। নিয়ম অনুযায়ী সে-ই পুলিসটিকে কিছুদিনের জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

পিকলু জিজ্ঞেস করল, আপনাদের কি সন্দেহ, যে গুলি করেছে সেই বন্দুকটা ঘরের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে ?

তপনবাবু বললেন, সেটা ভাবার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

—কেন ?

—কারণ, ঘরের দরজা জানলা সবই ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

পিকলু জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি এটা আত্মহত্যার ঘটনা বলে সন্দেহ করছেন ?

তপনবাবু বললেন, সেটাও ভাবা যাচ্ছে না, কেন না গুলিটা লেগেছিল ভদ্রলোকের মাথার পেছনে। তাছাড়া, পুলিসের কাছ থেকে ছিনতাই করা রাইফেলটাই বা ভদ্রলোক পাবেন কোত্থেকে ?

—তাহলে ?

—আমরাও আপাততঃ এই প্রশ্নটার সামনে এসেই আটকে গেছি পিকলু। নানা দিক দিয়েই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখছি।

পিকলু সামান্যক্ষণ ভেবে বলল, রাইফেলটার গায়ে কোন আঙ্গুলের ছাপ-টাপ পাননি ?

তপনবাবু বললেন, পাওয়া গেছে, কিন্তু কেমন অদ্ভুত কয়েকটা ছাপ।

—অদ্ভুত মানে ?

—ঠিক যেন পুরোপুরি স্বাভাবিক কোন মানুষের আঙ্গুলের ছাপ না। বোঝা যাচ্ছে, পুলিসের চোখে ধোঁকা দেবার জন্য অদ্ভুত ধরনের কোন দস্তানা পরে নিয়েছিল আততায়ী।

পিকলু সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, কাল আপনার সঙ্গে গিয়ে

বাড়িটা একটু দেখে আসা যাক, কাকু ?

তপনবাবু সামান্য কৌতুক বোধ করেন যেন। একটু হেসে বলেন, তুমি নিজে যখন একজন ক্ষুদে গোয়েন্দা, নিয়ে যাব'খন।

পরদিন সকালেই তপনবাবুর সঙ্গে বাড়িটা দেখতে গেল পিকলু। একটি ছোটখাট প্রাসাদই বলা চলে। বাড়িটার পেছন দিকে বিরাট আম বাগান।

ভদ্রলোক যেখানে নিহত হয়েছিলেন সেই ঘরে গিয়ে ভাল করে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় পিকলু। তারপর তপনবাবুকে জিজ্ঞেস করে, রাইফেলটা কোথায় পড়েছিল ?

তপনবাবু একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, এই জায়গাটায়।

—আর, ভদ্রলোক কোনদিকে মুখ করে শুয়েছিলেন ?

—ও পাশের দেওয়ালের দিকে।

পিকলু একবার ওপরের দিকে তাকাল। দেখল পুরোন দিনের বাড়ির মতই দেওয়াল আর উঁচু ছাদটার সংযোগ-স্থলে বড় কয়েকটা ঘুলঘুলি আছে। বাইরের আলো বাতাস আসার জন্য।

আর একবার মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখল, মেঝের মোজাইকের একটা জায়গায় যেন সামান্য চল্‌টা উঠে গেছে। খুব ভাল করে না দেখলে নজরে পড়ে না। হিজি-বিজি ডিজাইনের ভেতর মিশে গেছে চোট খাওয়া জায়গাটা।

তপনের দিকে তাকিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলল পিকলু, আততায়ী গুলি করেছিল ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে। তারপর অস্ত্রটা হঠাৎ হাত ফস্‌কেই পড়ে যাক, বা ফেলে দিয়ে যাক, ওখান থেকেই ছুঁড়ে ফেলেছিল এখানে। এখানকার মেঝেটা ভাল করে লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

এতক্ষণে মেঝের চলটা ওঠা জায়গাটা নজরে পড়ে তপনবাবুর। ওপরের দিকে তাকিয়ে একবার ঘুলঘুলির পজিশনটা দেখে নেন। তারপর পিকলুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলেন, আশ্চর্য, তুমি এত

সহজে ব্যাপারটা বুঝে ফেললে কি করে?

পিকলু সলজ্জে একটু হাসল শুধু।

এরপর থেকেই পিকলুর গুরুত্ব বেড়ে গেল তপনবাবুর কাছে। পিকলু সুযোগ পেলেই চলে আসত ওঁর বাড়ি। ইচ্ছে করেই থানায় যেত না। আর একটা কথাও বলে দিয়েছিল পিকলু তপনকাকুকে, এসব কথা যেন পিসেমশাইকে না জানান উনি। এ-সব খুন-খারাপীর ব্যাপারে ও জড়িয়ে পড়ছে ভেবে তাতে ভয় পেতে পারেন পিসিমা-পিসেমশায়।

ইতিমধ্যে পুলিস তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে খুনের তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল। আর পিকলু নিজের মনে পর-পর কয়েকটা পয়েন্ট সাজিয়ে নিচ্ছিল।

বৃদ্ধ চৌধুরীবাবুকে কেউ খুন করে থাকলে খুনের উদ্দেশ্য কি হতে পারে? টাকা-কড়ির দিকে খুনীর কোন লোভ ছিল না সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তাহলে একমাত্র কারণ হতে পারে—প্রতিহিংসা। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছে পিকলু, স্থানীয় বাসিন্দাদের ভদ্রলোক প্রসঙ্গে কিছু কৌতূহল ছিল ঠিকই, কিন্তু ওঁর প্রতি কারো কোন রাগ বা বিদ্বেষ ছিল না। তাহলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে কে? ভদ্রলোকের কি তাহলে পুরোন কোন শত্রু ছিল? তার ভয়েই কি গ্রামের সব কিছু বেচে দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন? বাড়িটাকে সুরক্ষিত করে তার আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন এভাবে?

এর একমাত্র উত্তর পাওয়া যেতে পারে একদিন ভদ্রলোকের আদি বাসস্থান সেই গ্রামে গেলে।

এর পরের প্রশ্ন, পুলিশটির কাছ থেকে যে তিনটি ছেলে বন্দুকটা ছিনতাই করেছিল, তারা তিনজনই নাকি বয়সে তরুণ। তাহলে কি চৌধুরীবাবুকে খুন করার জন্যই তারা অস্ত্রটা হাত করেছিল? কিন্তু তাদেরই বা ও-রকম এক বৃদ্ধকে খুন করার উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

আর একটি প্রশ্ন, আততায়ী খুনের সঙ্গী হিসেবে একটি ছোট

ছেলেকে নিয়ে আসবে কেন ? ঘুলঘুলি দিয়ে ছেলেটিকে নিচে নামিয়ে দিয়ে দরজা খুলে দেবার জন্য ? তাহলে সে চেষ্টা না করে ওখান থেকেই বা গুলি করবে কেন ?

দিন তিনেক পর কথায় কথায় তপনকাকুর কাছ থেকে নিহত চৌধুরীবাবুর আদি বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নেয় পিকলু। জায়গাটা এখান থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে। বাসেও যাওয়া যায়।

তপনকাকুর কাছ থেকে আর একটা নতুন তথ্য জানতে পারল পিকলু। কলকাতার ফরেন্সিক অফিস থেকে রিপোর্ট এসেছে, বন্দুকের গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে তা এমন কোন লোকের যার আঙ্গুল বিকৃত।

পরদিন কুশলকে নিয়ে চৌধুরীবাবুর সেই আদি গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল পিকলু। ছু'জনেই বাড়িতে বলে গেল, হাজার-দুয়ারী দেখতে যাচ্ছে, বিকেলেই ফিরে আসবে। কুশলের সঙ্গে যাচ্ছে বলে পিসিমা তেমন আপত্তি করেন নি।

সেই গ্রামে পৌঁছে এদিক-ওদিক খোঁজ-খবর করে, গ্রামের দু-একজন প্রাচীন ব্যক্তির কাছ থেকে চৌধুরীবাবুর যে ইতিহাসের আভাস পেল পিকলু তা মোটেই খুব উজ্জ্বল নয়।

চৌধুরীবাবুর বাবা প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি করেছিলেন এদিকে। ওঁর দুই ছেলে ছিল। প্রথম ছেলে এই নিহত সুবিমল চৌধুরী। দ্বিতীয় ছেলেটি বিয়ের এক বছরের ভেতর সদ্যোজাত একটি শিশু রেখে মারা গিয়েছিলেন। চৌধুরীবাবুর বাবা ছোটছেলের বিধবা স্ত্রী ও বাচ্চাটিকে খুবই স্নেহ করতেন।

কিন্তু কিছুদিন পর আচমকা একদিন ফুড-পয়জনিংয়ে নাকি সুবিমলবাবুর বাবা মারা যান। এরপর একদিন সুবিমলবাবু ঘোষণা করেন, বাবা মারা যাওয়ার আগে সব বিষয়-সম্পত্তি নাকি ওঁর নামে লিখে দিয়ে গেছেন। গ্রামের লোকদের কিছুটা সন্দেহ দেখা দেয় এ-ব্যাপারে, কিন্তু বাইরের লোক তাঁদেরই বা কি করার আছে।

এর কিছুদিন পর সুবিমল চৌধুরীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে নাকি ছোট

ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী ওর শিশু সন্তানটিকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। এরপরের কোন খবর গ্রামের লোকরা আর বলতে পারলেন না।

ওঁদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিল পিকলু, সেই বিধবা ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ি এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, মাইল বিশেক হবে। ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ির মোটামুটি একটা হদিশ তাঁদের কাছ থেকেই জেনে নিল পিকলু।

মনে মনে ভেবে দেখল, পিসিমার চোখে ধূলো দিয়ে আবার একদিন এখানে আসা হয়তো সম্ভব হবে না তাই কুশলকে নিয়ে সেখান থেকেই সেই বিধবার বাপের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ইতিমধ্যে কুশলকে অবশ্য আভাসে-ইংগিতে ওর জানাতে হয়েছিল যে, খুনটা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত কিছুটা কৌতূহল মেটানোর জন্যই এ-সব করছে ও।

সেই গ্রামে পৌঁছে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল পিকলু, ভদ্রমহিলা এখানে এসে ভাইয়ের ঘাড়ে চাপায় ভাইরাও খুব খুশি ছিল না। তাদের অবস্থা সেরকম ভাল না থাকাও এর একটা কারণ হতে পারে।

পরের পুরো ঘটনা জানতে পারল না পিকলু, কিন্তু শুনল, ভদ্রমহিলা বছর খানেক পর নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন। কেন, সেটা কেউ সঠিক ভাবে বলতে পারল না।

এরপর থেকে সেই বাচ্চা ছেলেটি, অর্থাৎ নিহত চৌধুরীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র, ওর দিদিমার কাছেই মানুষ হচ্ছিল। ছেলেবেলা থেকেই নাকি কিছুটা বেপরোয়া ধরনের ছিল ছেলেটি। মা-বাবার স্নেহ-বঞ্চিত বাচ্চারা অনেক সময়ই ও-রকম হয়। ছেলেটির নাম ছিল লালটু। কানের পাশে ছোট্ট একটা কাটা দাগ ছিল ওর। একবার খেজুর গাছ থেকে পড়ে আহত হয়েছিল বলে।

সেই ছেলেটিও নাকি বছর আঠের বয়সের সময় কাউকে কিছু না বলে একদিন বাড়ি থেকে চলে যায়। প্রবীণ এক ভদ্রলোক বললেন, যতদূর জানি, ছেলেটি নাকি পরে এক সার্কাস পার্টিতে যোগ দিয়েছিল।

হাজরা সার্কাস পার্টি না কি যেন নাম ছিল সেই সার্কাস দলের।

বিকেলে বাসে ফিরতে ফিরতে শুধু একটা প্রশ্নই বারবার মনে হতে থাকে পিকলুর, সেই ছেলেটিই এতদিন পর, ওদের জীবন তছনছ করে দেবার জন্য, জ্যাঠার ওপর প্রতিশোধ নিল না তো?

পরদিন সকালেই ঘুরতে ঘুরতে একবার তপনবাবুর বাড়ি গেল পিকলু। কথায় কথায় এক সময় জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কাকু, আপনি কোনদিন 'হাজরা সার্কাস পার্টি' নামে কোন সার্কাস দলের নাম শুনেছেন?

তপনবাবু স্মৃতিচারণ করে বললেন, খুব ছেলেবেলায় নামটা যেন শুনেছিলাম বলে মনে পড়ছে। বাবার সঙ্গে একবার সেই দলের সার্কাসও দেখেছিলাম। কেন বলতো?

পিকলু বলল, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম। আচ্ছা দলটা কি কলকাতার ছিল?

তপনবাবু বুঝতে পারেন, পিকলু উদ্দেশ্যহীন ভাবে জিজ্ঞেস করছে না এসব। বললেন, যতদূর শুনেছিলাম, সেই দলের মালিক হাজরাবাবুর বাড়ি নাকি রাণাঘাটে ছিল। এখনও বেঁচে আছেন কিনা কে জানে!

পিকলু বলল, আপনাদের পুলিসের সোর্সে খবরটা একটু জেনে দিতে পারেন?

তপনবাবু বললেন, চেষ্টা করে দেখছি।

দিন তিনেক বাদেই তপনবাবু পিকলুকে ডাকিয়ে এনে বললেন, হদিশ পাওয়া গেছে। সেই হাজরাবাবু এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। ওঁর সার্কাস দল অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কি একবার দেখা করতে চাও তুমি?

পিকলু বলল, তাহলে খুবই ভাল হয়। ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা খবর নেবার ছিল আমার।

পিকলু নিজে থেকে ব্যাপারটা ভাঙ্গছে না বলে তপনবাবুও আগ

বাড়িয়ে কিছু জানতে চাইলেন না। বললেন, তোমাকে ওখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু বাড়িতে কি বলবে ?

পিকলু চাপা উৎসাহে বলল, সে আমি কুশলের সঙ্গে আলোচনা করে পিকনিক-টিকনিকের কথা বলে একদিনের জন্য কাটার ব্যবস্থা করতে পারব। তাহলে কিন্তু কুশলকেও আমার সঙ্গে নিতে হবে।

তপনবাবু বললেন, সে তোমার ইচ্ছে। পরশু সকালে তাহলে তৈরী হয়ে এস, আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোকের গাড়িতে করেই তোমাদের রাণাঘাটে ঘুরে আসার ব্যবস্থা করে দেব'খন। সঙ্গে কিন্তু সাদা পোষাকে আমাদের একজন পুলিসও থাকবে। তোমাদের নিরাপত্তার জন্যই।

পিকলু একটু হেসে বলল, আমরা দারুণ বিপদজনক কোন অভিযানে যাচ্ছি না তবু দেবেন, আপত্তির কি আছে ?

পিসিমাকে ধাপ্পা দিয়ে বেরিয়ে আসতে খুব একটা অসুবিধে হল না পিকলুর। লম্বা একটা মোটর-ড্রাইভও বেশ ভালই লাগছিল।

রাণাঘাটে পৌঁছে এক জায়গায় গাড়িটা রেখে সাদা পোষাকের পুলিস ভদ্রলোক বললেন, আমার সঙ্গে এস। গলিটায় গাড়ি ঢুকবে না।

হাজরাবাবুর বাড়ি গিয়ে পিকলু দেখল, ভদ্রলোক বয়সের ভারে একেবারে জবুথবু হয়ে গেছেন। পুরোন দিনের সব কথা ভাল করে মনে করতেও পারেন না।

পিকলু কথায় কথায় পুরোন দিনের ওঁর সার্কাস দলের কথা তুলল। বৃদ্ধ এতে যেন কিছুটা চাঙা হয়ে উঠলেন। পিকলু শুনেছিল, স্মৃতির বিজ্ঞান বলে, মানুষ সাধারণত অপ্রিয় বা অপ্রয়োজনীয় কথা আগে ভোলে, কিন্তু প্রিয় স্মৃতি বহুদিন মনে থাকে লোকের।

কাটা-কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে বৃদ্ধ হাজরাবাবু ওর সার্কাস দলের অনেক কথা শোনালেন পিকলুকে।

পিকলু এক সময় জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনার সার্কাস দলে

লালটু নামে কোন খেলোয়াড় বা কর্মচারী ছিল কোনদিন ?

লালটু ! মনে মনে স্মৃতি হাতড়াতে থাকেন হাজরাবাবু।

পিকলু একটা সূত্র এগিয়ে দিয়ে বলে, কানের কাছে একটা কাটা দাগ ছিল তার।

এবার মনে পড়ে হাজরাবাবুর। বলেন, হ্যাঁ, ছিল একজন। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে লালটু না, বোধহয় লাল মিঞা নাম ছিল ছেলেটার।

পিকলু বলল, কি কাজ করত সে আপনার সার্কাস দলে ? হাজরা বললেন, ওর ওপর দায়িত্ব ছিল ভালুক, ছাগল আর বাঁদরের খেলা দেখানোর। ছেলেটা একটু খিটখিটে আর বদরাগী ছিল বটে, কিন্তু দারুণ এলেম ছিল ছেলেটার। ভালুক, ছাগল আর বাঁদরগুলোকে এমন সব মজাদার খেলা শিখিয়েছিল, যে দর্শকরা মুখিয়ে থাকত, কখন —লাল মিঞা না কি নাম যেন—সে ভালুক, ছাগল আর বাঁদর নিয়ে রিঙে ঢুকবে।

সেই লাল মিঞা আর তার খেলা প্রসঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বহু কথা জেনে নেবার পর পিকলু জিজ্ঞেস করল, সেই লালমিঞা কতদিন ছিল আপনার সার্কাস দলে ?

একটু ভেবে বললেন বৃদ্ধ হাজরা, বছর দশেক। তারপর একদিন মাইনে বাড়ানো নিয়ে আমার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করল। পরদিন সকালে উঠে দেখি, লালমিঞা নেই। আমার মানিব্যাগটা হাতড়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় ক্ষতি হল আমার ওর সেই বাঁদরটা পর্যন্ত ও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায়।

উত্তেজনায় গলার কাছটা আটকে আসছিল পিকলুর। তবু নিজেকে সামলে ও জিজ্ঞেস করল, তারপর সেই লালমিঞার কোন খোঁজ পাননি আপনারা ?

হাজরাবাবু বললেন, না। পুলিসেও ডাইরি করেছিলাম, কিন্তু তারাও কোন হদিশ দিতে পারল না। অবশ্য কয়েকদিন পরই আমরা দল নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে খেলা দেখাতে চলে গিয়েছিলাম।

যা জানার জানা হয়ে গেছে পিকলুর। আর দু'চারটা সাধারণ কথাবার্তার পর হাজরাবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার গাড়িতে এসে বসে ওরা।

সারা পথ দারুণ গম্ভীর আর অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে ভাবতে আসে ও। কুশলও ওর সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তিবোধ করছিল।

হাজরাবাবুর কাছে লালমিঞার গল্প শোনার পর বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটা কথা মনে পড়ে পিকলুর। গুলির শব্দ শুনে মালি ছুটে এসে দেখেছিল, লম্বা একটা কালো ছায়ার পেছনে পেছনে একটা বাচ্চা ছেলে যেন লাফাতে লাফাতে চলে গেল।···ফরেন্সিক থেকে রিপোর্ট এসেছে, বন্দুকের গায়ে যে আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে তা স্বাভাবিক আঙ্গুলের নয়, আঙ্গুলগুলো বিকৃত ছিল মনে হয় আততায়ীর। ছাপগুলো বাঁদরের অঙ্গুলের নয় তো?···লালমিঞার বাঁদরটা ওর ইশারায় পুলিশবেশী জোকারের পাশ থেকে বন্দুকটা নিয়ে পালিয়ে আসত।

একই সঙ্গে মুহূর্তের জন্য আর একটা কথা মনে পড়ে পিকলুর। ও পিসিমার বাড়ি আসার পর একদিন কুশলকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে বাজারে এক বাঁদর-ওয়ালাকে বাঁদরের খেলা দেখাতে দেখেছিল। লোকটা কি এখনও আছে সেখানে, না চলে গেছে?

বিকেলে ফিরে এলে তপনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি পিকলু, কিছু পেলে?

একটু গম্ভীর গলায় বলে পিকলু, ছেঁড়া-ছেঁড়া কিছু আলগা সূত্র যেন পাচ্ছি। কিন্তু সেগুলো যোগ-বিয়োগ করে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে আপনাদের সেই সাসপেণ্ড পুলিস ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার গোপনে কয়েকটা কথা বলার দরকার আমার।

তপনবাবু বললেন, বেশ, ব্যবস্থা হবে।

পরদিনই সেই পুলিস ভদ্রলোকের বাড়িতে পিকলুকে একজন লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তপনবাবু।

ভদ্রলোক বোধহয় পিকলুর মত একটি কিশোরকে দেখে একটু

অবাক হলেন। উনি ভেবেছিলেন, বোধ হয় বয়স্ক কোন অফিসার এনকোয়ারিতে আসছেন।

কথায় কথায় পিকলু একসময় জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, সেদিন রাতে ক'টি ছেলে এসেছিল আপনার কাছ থেকে রাইফেল ছিনতাই করতে?

ভদ্রলোক বললেন, তিনজন। হঠাৎ পেছন দিক থেকে এসে আমাকে আক্রমণ করে—

পিকলু বলল, আমি যদি বলি মাত্র একজনই এসেছিল। এবং সেও আপনাকে আক্রমণ করেনি, ঘুমন্ত আপনার পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে পালিয়েছিল?

ভূত দেখার মত যেন চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা।

পিকলু বলল, দেখুন, এখন আর নষ্ট করার মত সময় নেই। নিহত চৌধুরী বাবুর ঘরে আপনার ছিনতাই হওয়া অস্ত্রটা পাওয়া যাওয়ায় পুলিস কিন্তু এই খুনের সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছে।

শুনে এবার রীতিমত ঘাবড়ে যান ভদ্রলোক।

পিকলু ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে বলল, আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবেই কিন্তু এখন আপনার সত্য কথাটা বলাই ভাল।

ভদ্রলোক এবার অকপটে সব কথা স্বীকার করেন। শুনে পিকলু খুশি হল। বুঝল, ওর অনুমানই ঠিক। হিসেবটা মিলেছে ওর। ভদ্রলোককে অভয় দিয়ে ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা তপনবাবুর বাড়িতে এল পিকলু।

তপনবাবু বললেন, যেজন্য গিয়েছিলে, সে কাজ হল?

পিকলু বলল, ঠিক বুঝছি না। কিন্তু এখন আপনাকে একটা অন্য অনুরোধ জানাব।

তপনবাবু বললেন, বল।

পিকলু হেসে বলল, আমাকে একদিন একটু বাঁদরের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

তপনবাবু অবাক হয়ে বললেন, মানে ?

পিকলু বলল, কিছুদিন হল এখানে নাকি একজন বাঁদরওয়ালা নানা রকম খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে আজ বিকেলে এখানে ডাকিয়ে এনে একটু খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন ?

তপনবাবু বললেন, আমার বাড়িতে ?

পিকলু বলল, হ্যাঁ। যে ডাকতে যাবে সে যেন বলে, দারোগাবাবুর ছেলেমেয়ে আর বাড়ির মেয়েছেলেরা একবার বাঁদর খেলা দেখতে চেয়েছে।

তপনবাবু বললেন, এ আর এমন কঠিন কাজ কি ? কিন্তু তোমার মতলবটা কি শুনি ?

পিকলু একটু হেসে বলল, আপাততঃ একটু বাঁদর নাচ দেখা। সেই সঙ্গে আর একটা ছোট কাজ করতে হবে।

—কি ?

—থানা থেকে একটা রাইফেল বাড়িতে এনে রাখবেন। গুলিভরা না থাকে যেন। একটা আনলোডেড রাইফেল।

তপনবাবু বললেন, এনে রাখব। লোকটিকে ক'টা নাগাদ ডেকে পাঠাব ?

পিকলু বলল, পাঁচটা।

তপনবাবু বললেন, ঠিক আছে ?

পিসেমশায় ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছিলেন, পিকলু যেন সব সময়েই কেমন অন্যমনস্ক থাকে। তপনের বাড়িতেও মাঝেমাঝে যাতায়াত করে। এখানে এসেও কোন কিছুর সঙ্গে আবার জড়িয়ে পড়ছে না তো ছেলেটা ?

সেটা বুঝতে পেরেই বিকেলে পিসেমশাইকে গিয়ে বলে পিকলু, পিসেমশায়, বাঁদরখেলা দেখবে ?

পিসেমশাই বললেন, কোথায় ?

পিকলু বলল, তপনকাকুর বাড়িতে। আজ রাস্তায় হঠাৎ ওঁর সঙ্গে

দেখা হয়েছিল। উনিই বললেন, আজ বিকেলে এক বাঁদরওয়ালা আসবে ওঁর বাড়ির সবাইকে খেলা দেখাতে। আমাকেও যেতে বললেন। চল না, দেখে আসি।

বয়স হলেও পিসেমশায়ের ভেতর একটা ছেলেমানুষি ছিল। উনি বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললেন, আপত্তির কি আছে? চল দেখে আসি।

পিকলুরা গিয়ে দেখল পাড়ার বাচ্চাদের আবদারে বানরওয়ালা খেলা দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। দারোগাবাবুর বাড়ি খেলা দেখাচ্ছে, তাই বাঁদরটাকে বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে এনেছে লোকটি।

পিকলুরা প্রবেশ করতেই পিকলু আর তপনবাবুর ভেতর চোখের ইশারা হল।

পাড়ার কিছু মহিলাও এসে জুটে ছিলেন খেলা দেখতে। তাঁরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখছিলেন। বেশ মজা পেয়ে পিসেমশায়ও ওদের পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন।

পিকলু ইশারায় তপনবাবুকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, রাইফেলটা দিন। আর আপনি গিয়ে গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি ইশারা করলেই আমার কাছে চলে আসবেন। না হলে চুপচাপ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। বুঝবেন শেষ পর্যন্ত আমার হিসেব মেলেনি।

পিকলুর হাতে খালি বন্দুকটা তুলে দিয়ে তপনবাবু নিঃশব্দে গিয়ে গেটের মুখে দাঁড়ালেন।

পিকলু রাইফেলটা যতদূর সম্ভব প্যাণ্টের পায়ের আড়ালে লুকিয়ে সামনে গেল। বাচ্চাদের একটু সরিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে বসল। রাইফেলটা নিজের সামনে শুইয়ে রাখল। দু'একজন ছাড়া ব্যাপারটা খেয়ালও করল না।

বাঁদরওয়ালা কিন্তু ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। ওর ভেতর কেমন একটা চাপা অস্বস্তি টের পেল পিকলু। বড় বড় চুলে আর জুলপিতে কপাল আর কানের পাশটা ঢাকা থাকায় লোকটার কানের পাশে কোন কাটা দাগ আছে কিনা বুঝতে পারছিল না পিকলু।

এমন সময় আচমকা একটা ঘটনা ঘটে গেল। বাঁদরওয়ালা সতর্ক হবার আগেই বাঁদরটা হঠাৎ এক লাফে পিকলুর সামনে এসে ছোঁ মেরে রাইফেলটা নিয়ে মালিকের কাছে পালিয়ে গেল। তারপর বেশ পাকা শিকারীর মত সেটা তুলে ধরে ট্রিগারে একটা টান দিল।

বাঁদরওয়ালা যেন ভয়ে আঁৎকে উঠল। হাতের ছড়িটা দিয়ে সপাং করে পিঠে মারল বাঁদরটার। তারপর খিঁচিয়ে উঠল, শালা বেতমিজ, উল্লু কাঁহাকা। চল।

পিকলুর ইশারায় ছুটে এলেন তপনবাবু। পিকলু বলল, কাকু, এখন একে গ্রেপ্তার করতে পারেন। আমার হিসেব মিলে গেছে। এখন শুধু একটা কাজ বাকী, এই রাইফেলটা কলকাতায় পাঠিয়ে আঙ্গুলের ছাপটা একবার পরীক্ষা করিয়ে আনা।

বাঁদরওয়ালা এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু দু'দিক দিয়ে দু'জন সাদা পোষাকের পুলিস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। চারদিকে হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল।



দিন চারেক পরে কলকাতা থেকে রিপোর্ট এল, এই বন্দুকটির আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে আগের রাইফেলের হাতের ছাপ অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বড় একটা চা-চক্রের আয়োজন করলেন তপনবাবু। সপরিবারে নিমন্ত্রিত হলেন পিসেমশায়, কুশলদের বাড়ির সবাই আর সস্ত্রীক থানার দু'একজন অফিসার।

পিকলুর জন্যই সবাই অপেক্ষা করছিল। পিকলু ঘরে ঢুকতেই সবাই হৈ-হৈ করে সম্বর্ধনা জানাল ওকে। পিসিমা কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। হঠাৎ ওঁদের পিকলুকে নিয়ে হৈ-হৈ করছে কেন সবাই বুঝতে পারেন না। পিকলু একটু হেসে পিসিমাকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। নিজেও পাশের চেয়ারটায় বসল।

তপনবাবু বললেন, পিকলু, আজকের এই টি-পার্টি তোমার অনারেই থ্রো করেছি আমি। এবার বল তো, কি করে তুমি খুনের রহস্যটা উদ্ঘাটন করলে?

পিসিমা অবাক হয়ে পিকলুর দিকে ফিরে তাকান। ঘটনার মাথা-মুণ্ডু কিছুই মাথায় ঢুকছে না ওঁর।

পিকলু আস্তে পিসিমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, তপনকাকুর মুখে খুনের ঘটনাটা শুনে আর নিহত চৌধুরীবাবুর ঘরটা দেখে আমার পরই আমার মনে হয়েছিল, এটা নির্ঘাৎ কোন প্রতিহিংসার ঘটনা। কিন্তু এতদিন পর ও-রকম এক বৃদ্ধের ওপর কে প্রতিশোধ নিতে পারে?

তপনকাকুকে বলেই কুশলকে নিয়ে একদিন তাই চৌধুরীবাবুর গ্রামে গেলাম খোঁজ-খবর নিতে। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, যৌবনে চৌধুরীবাবু ওঁর বিধবা ভাই-বৌ আর শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে বঞ্চিত করে সব বিষয়-সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করেছিলেন। ওঁর নিষ্ঠুর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে শিশু সন্তানটিকে নিয়ে বিধবা ভদ্রমহিলা নিজের বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

তপনবাবু বললেন, তারপর?

—কুশলকে নিয়ে খোঁজ করতে করতে ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ি চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে প্রাচীন দু'একজন অধিবাসীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, বাপের বাড়ি আসার কিছুদিন পর সেই বিধবা ভদ্রমহিলা নাকি, কেন কে জানে, আত্মহত্যা করেছিলেন।

পিসেমশাই বললেন, আর সেই বাচ্চাটা?

পিকলু বলল, ওর দিদিমার কাছে মানুষ হতে লাগল। ছেলেটি ছেলেবেলা থেকেই নাকি কেমন বদরাগী আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। মা-বাবার স্নেহ-বঞ্চিত অবহেলিত ছোটরা যা হয় আর কি। এমন সময় ছেলেটি হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। গিয়ে চাকরি নেয় 'হাজরা সার্কাস পার্টি' নামে এক সার্কাসের দলে। শুনেই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, অন্তত একজনের সন্ধান পাওয়া গেল, চৌধুরীবাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবার যার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু সেই ছেলেটি, অর্থাৎ লাল্টুর সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়?

তপনবাবু বললেন, সেজন্যই কি তুমি রানাঘাটে গিয়েছিলে সেই সার্কাস পার্টির মালিক হাজরাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে?

পিকলু বলল, হ্যাঁ। গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক বয়সের ভারে একেবারে জবুথবু হয়ে গেছেন। কিছুটা স্মৃতিভ্রষ্টও হয়েছেন। নানা প্রশ্ন করে ওঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, বেশ বেপরোয়া ধরনের ঐ বয়সী একটি যুবক এসে একবার যোগ দিয়েছিল ওঁর দলে। কিন্তু ছেলেটির নাম লালটু ছিল না, লালমিঞা ছিল। ছেলেটা ভালুক, ছাগল আর বাঁদরের খেলা দেখাত। ওর সবচেয়ে নাম করা খেলা ছিল —'ডাকু বাঁদর' নামে একটা খেলা।

রুদ্ধশ্বাসে সবাই পিকলুর বিবরণ শুনছিল। তপনবাবুর স্ত্রী বললেন, খেলাটা কি ধরনের?

—দলের একটি জোকার পুলিস সেজে, বন্দুকটা পাশে রেখে ঘুমিয়ে থাকত। বাঁদরটা লালমিঞার ইশারায় এক লাফে গিয়ে বন্দুকটা তুলে এনে, নির্ভুল নিশানায় প্রায় দশ ফুট দূরের একটা বেলুন গুলিবিদ্ধ করে ফাটিয়ে দিত।

চাপা উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলেন সেকেণ্ড অফিসার ভদ্রলোক। বললেন, তারপর ?

পিকলু একটু থেমে থেকে বলল, পরপর কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে পড়ল আমার। চৌধুরীবাবুর বাড়ির মালী গুলির শব্দে বেরিয়ে এসে দেখেছিল, অন্ধকারে দুটি কালো ছায়ামূর্তি ছুটে সদর দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের একজন খুবই বেঁটে, ছোট কোন ছেলের মত। ছেলেটা যেন লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল লম্বা লোকটার সঙ্গে। তারপর একটা অঙ্ক মনে পড়ল। চৌধুরীবাবুর ঘরের ঘুলঘুলি থেকে ওঁর বিছানার দূরত্ব ফুট দশেকই হবে। হিসেব মেলাতে বাকী থাকল তখন আর একটি অঙ্ক। রাইফেল ছিনতাই হওয়ায় যে পুলিস ভদ্রলোক সাসপেণ্ডেড হয়ে আছেন তাঁর কাছ থেকে জানা, সত্যই কারা বা কজন ছেলে এসে ওঁর রাইফেলটা ছিনতাই করেছিল। ভদ্রলোককে নানারকম আশ্বাস দিয়ে যা জানলাম, তাতে আমার শেষ হিসেবটাও প্রায় মেলার মুখে চলে এল।

তপনবাবু বললেন, কি শুনেছিলে ওঁর কাছ থেকে ?

পিকলু বলল, আসলে তিনজন নয়, একজনই ওর রাইফেল নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক পাহারা দিতে দিতে মাঝরাতে এক জায়গায় বসেছিলেন একটু বিশ্রাম করতে। কখন যে একটু ঝিমুনি এসেছিল উনি নিজেই জানেন না। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল রাইফেলে টান পড়ায়। তাকিয়ে দেখেন, অন্ধকারে বেঁটে একটা ছায়ামূর্তি যেন লাফাতে লাফাতে জঙ্গলের ভেতর মিলিয়ে গেল। নিজেকে বাঁচানোর জন্যই ভদ্রলোকমশায় এসে বানিয়ে বলেছিলেন ছিনতাইয়ের ঘটনাটা।

তপনবাবু বললেন, হিসেবটা আমিও এবার প্রায় মিলিয়ে এনেছি। বাঁদর খেলার ব্যবস্থাটা সেজন্যই আমাকে দিয়ে করিয়েছিলে তুমি ? শেষ অঙ্কটা মিলিয়ে নেবার জন্য ?

একটু হেসে বলল পিকলু, ঠিকই অনুমান করেছেন আপনি এবং শেষ অঙ্কটাও যে মিলে গেল সে তো নিজের চোখেই দেখলেন। শুনলাম, লোকটি নাকি নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে ?

তপনবাবু বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু নিজের হাতে সে কাউকে হত্যা করেনি। করেছে একটি বাঁদর। তাই একদিক দিয়ে এটিকে একটি —অমানবিক হত্যাকাণ্ডই বলা যায়, কি বল ?

এতক্ষণ অভিভূতের মত সবাই পিকলুর কথা শুনছিল। এবার সোচ্চারে সবাই পিকলুর তারিফ করতে শুরু করে।

এরই ভেতর পিসিমা হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন। পিকলুর দিকে তাকিয়ে বলেন, ডাকাত ছেলে, আমাকে ফাঁকি দিয়ে এতবড় একটা খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলি তুই। খুনীরা যদি জানতে পেরে তোকেও গুলি করে মারত, তোর মা-বাবার কাছে কি জবাবদিহি করতাম আমি ?

পিকলু হেসে পিসিমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, মারতে তো পারেনি, দিব্বি সশরীরে বেঁচে আছে তোমার ভাইপোটি। এখন কাঁদছ কেন ? এতদিন একটা উত্তেজনার ভেতরে ছিলাম, ভাল করে তোমার আম-কাঁঠালের সদ্ব্যবহার করতে পারিনি। এবার কিন্তু—

পিসিমা দু'হাতে পিকলুকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, ডাকাত, তুই একটা আস্ত ডাকাত ছেলে। বড় হলে তুই নিজেও একটা খুনে হবি, বুঝলি ? এই বয়সেই এত সব রাজ্যের খুন-খারাপির বই পড়লে হবে না এমন ?

এত লোকের সামনেই নির্লজ্জ পিকলু পিসিমার গালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে দেয়। সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে। এতক্ষণে ভাইপোর গর্বে পিসিমাও সবার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেন।

এরপর পিকলুকে কেন্দ্র করে সেদিনের চায়ের আসর কেমন জমে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সবিস্তারে বর্ণনা দেবার কোন প্রয়োজন নেই!

—শেষ—